পুঁজি'র

পরিণতি

শাহ্ আলম

প্রকাশনায়:
ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম
বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২
চাঁদপুর, বাংলাদেশ।

www.icwfreedom.org
e-mail:
icwfreedom@gmail.com
icwfreedom@yahoo.com
Mob: (880)+ 01675216486,
01715345006,01717895857.

প্রকাশকাল: নভেম্বর-২০১১।
মুদ্রণে-
দি চিত্রা প্রিন্টার্স
২০, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

১২০ টাকা।

সুত্রপাত

পুঁজি'র ভূত-বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে- 'পুঁজি' লিখেছেন কার্ল মার্কস। বিশাল গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতটা বিস্তৃত তা উল্লেখ না করেও কেবলই পুঁজির ব্যাপ্তী ও বিস্তৃতি প্রমাণে এই তথ্যই যথেষ্ট যে- পুঁজি'র ইংরেজী ভার্ষণ মোট ৬ টি বৃহৎ পুস্তক হিসাবে প্রকাশ করেছে , প্রগতি প্রকাশন, মস্কো। বাংলাও তাই। এমনকি কলকাতা, ভারতের বাণী প্রকাশনও মোট ছয়টি বই হিসাবে বাংলা ভার্ষাণে প্রকাশ করেছে-'ক্যাপিটাল'। পুঁজি, পুঁজির উদ্ভব, পুঁজি উৎপন্নের আপেক্ষিক হার, পুঁজির বিকাশ, পুঁজির ভূমিকা, পুঁজির অনুসন্ধানকারী এডামস্মীথ সহ অপরাপর অনুসন্ধানী ও গবেষকদের পুঁজি বিষয়ে সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা, বা নীরবতা, বা ভুল বা ভ্রান্তি বা ক্ষেত্র বিশেষ সক্ষমতা ও যথার্থতা, পুঁজির মালিকানা ও স্ববিরোধীতা,পুঁজির শেষ অবস্থা বা সর্বোচ্চ পর্যায়, পুঁজির পরিণতি ইত্যকার সকল বিষয়ই তন্ন তন্ন করে যেমন অনুসন্ধান করেছেন তেমন বৈজ্ঞানিকভাবে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সূত্রায়ন ও তত্ত্বায়ন করছেন মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থে।

তাছাড়া- মার্কস ও এ্যাংগেলস দু'জনেই আরো বই-পুস্তক ও নিবন্ধাদি লিখে- পুঁজি'র পরিণতি যে খোদ পুঁজিরই অন্তর্ধান, তা -প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত তত্ত্ব, তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণাদি সমেত যুক্তিযুক্ত যুক্তি দ্বারা যথাযথভাবে প্রমাণ ও যুক্তিযুক্ত করেছেন।

পুঁজি অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব ভুল একথা পুঁজিপতিদের সেবক পুঁজিতন্ত্রী আর্থনীতিকরা প্রমাণ করতে পারছে না। আবার সত্যতা স্বীকার করলেও পুঁজি'র-পরিণতি যে, ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্তির সাথে সাথে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলোপ এবং একই সাথে পুঁজির উচ্ছিষ্টভোগী পুঁজিতন্ত্রের সেবক আর্থনীতিক বা অর্থনীতিবিদদেরও অর্থনীতি বিষয়ে মৌরশী পাট্টাসহ প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সমেত নিজেরও বিলুপ্তি, তা কবুল করতে হয়। কিন্তু, পুঁজিপতি মাত্রই যেমন স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় তাবৎ দুস্কর্মে পিছপা হয় না, তেমন পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিজীবীরা নিজেদের পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষায় পুঁজির গোপন রহস্য বিষয়ে গোপনীয়তা ও নীরবতাই শ্রেয় মনে করে। অত:পর, পুঁজি বিষয়ে অর্থাৎ পুঁজির উদ্ভব-বিকাশ ও পরিণতি- সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কস-এ্যাংগেলসদের এত্তোসব বই পুস্তক থাকা সত্ত্বেও পুঁজি, পুজিতন্ত্র ইত্যকার বিষয়ে " পুঁজি'র পরিণতি" লেখার আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতা বিষয়ে একটি যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ৎ বিধেয়।

পুঁজি-সঞ্চালনের মাধ্যমে বিকাশের জন্য পণ্যের বাজারের সন্ধানে বের হয়ে সমগ্র দুনিয়া জয়-দখল করেছে। ভেংগে চুর-মার করেছে সারা দুনিয়ার স্থানীয় ও স্বনির্ভর অর্থনীতি। পরাজিত -পরাভূত , দখলচ্যুত , উচ্ছেদ ও অধীনস্ত করেছে প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অধিপতি তথা সামন্ত সমাজের প্রভু শ্রেণীকে। সমগ্র দুনিয়ায় কার্যকরী করেছে পণ্য অর্থনীতি। এটি পুঁজি'র বিকাশে আবশ্যকীয় উপনিবেশিকতা নীতির ফলশ্রুতি। পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশ ও বিজয়কালীন ভূমিকাকে বিপ্লবী হিসাবে যথার্থভাবেই চিহ্নিত ও স্বীকার করে ঐতিহাসিক গতি এবং ইতিহাসের নিয়মের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন মার্কস।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও পুঁজিপতি শ্রেণী শোষক বলেই অতীতের শোষক শ্রেণীগুলির মতোই শোষিত শ্রেণীর - দুশমন। পুঁজিতন্ত্রে , দুশমনিটা শুরু হয় শোষিত- শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম শর্তেই।কাজেই, জন্ম শর্তেই জন্মাবদি পুঁজিপতি শ্রেণী শোষক এবং শ্রমিক শ্রেণী শোষিত।

তাই পুঁজিতন্ত্রে - শ্রমিক ও পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পর্কটা বৈরীমূলক। পুঁজি'র উৎপন্নের শর্তেই এ বৈরীতা অবসানের সুযোগ নাই পুঁজিতন্ত্রে। তাই শোষক-শোষিতের স্বার্থজনিত বিরোধ-বৈরীতা তথা পুঁজিপতিদের শোষণ অব্যাহত রাখা ও শোষণ হতে রেহাই ও মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রচেষ্টা হেতু শ্রেণী সংগ্রাম- পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বৈশিষ্ট্য।

উপনিবেশিকতা নীতি কার্যকরণে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেও ঘর ছাড়া- দেশ ছাড়া হয়েছে; ভিন দেশে বসতি গেড়েছে। সামন্ত নিগড়ে বন্দী কৃষক-কারিগরকে মুক্ত ও উচ্ছেদ করে শিল্পের শ্রমিক বানিয়ে কার্যত শ্রমিক শ্রেণীকেও কেবল বাস্তুচ্যুত নয়, বরং কেবলমাত্র শ্রম শক্তি বিক্রি করে জীবন যাপনে বাধ্য করে মজুরি দাসে পরিণত করে শ্রমিক শ্রেণীর জাত-জাতি পরিচয় বিলীন করে দেশহীনে পরিণত করেছে। অত:পর, দুনিয়ার সকল শ্রমিক তথা শ্রম শক্তি বিক্রেতার একটাই মাত্র পরিচয় হাসিল হয়েছে আর তা হচ্ছে তারা কেবলই শ্রমিক। কাজেই, শ্রম শক্তি ক্রেতা ছাড়া ভিন জাতি ইত্যকার কারো সার্থে শ্রমিকের বিরোধ-বৈরীতা নাই। তাই, কেবলই শ্রম শক্তি বিক্রির হেতুবাদে দুনিয়ার সকল শ্রমিকের সমস্যা-সংকট ইত্যাদি যেমন একই ধরণের তেমন তা হতে মুক্তি লাভের উপায়ও ভিন্ন নয়। সুতরাং, দুনিয়ার সকল শ্রমিক অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী নিজেই পরিণত হয়েছে একটা মাত্র জাতিতে তথা শ্রমিক শ্রেণীতে। তাইতো এক বিশ্ব, এক সমাজ ও মুখিমুখি দন্ডায়মান দুই বৈশ্বিক শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রের চিত্র। ফলশ্রুতিতে সমগ্র বিশ্বটা যেমন কেবলমাত্র একটা একই বা একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা পণ্য উৎপাদনী সমাজে পরিণত হয়েছে তেমন এই একক বৈশ্বিক অর্থনীতির জালে আটক বুর্জোয়ারাই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বোধ -চেতনা তথা আন্ত র্জাতিকতার ভিত্তি দিয়েছে । যেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর ইচ্ছানিরপেক্ষ ঐতিহাসিক কাজ ও করণীয় ছিল এবং বুর্জোয়ারা তা করতে বাধ্য হয়েছে- পুঁজির শর্তে।

বিজয়ী পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর সহিত বৈরীতায় সম্পর্কিত বলে পুঁজিতন্ত্রের বার্ধক্য - প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগে পুঁজিপতি শ্রেণী ঐতিহাসিক নিয়মেই প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় উপনীত হয়ে স্বীয় ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় পুন:পুন সংকট ও মন্দার জন্ম দিয়ে পুঁজির সামাজিক চরিত্রের সহিত সায়্যুয ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক মালিকানার সামাজিক ব্যবস্থা পত্তনে পুঁজির স্ববৈরীতার অবসানে পুঁজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বীয় মুক্তি অর্জন সমেত মানবজাতির মুক্তি সাধন করে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের সুযোগ-সুবিধার তথা ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটাবে স্বয়ং শ্রমিক শ্রেণী।

কারণ, পুঁজির স্রষ্টা হয়েও পুঁজির মালিক না হওয়া অর্থাৎ উৎপাদনের শক্তি বা উপায়ের মালিকানাহীন বলেই শ্রমিক শ্রেণীই ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় যোগ্য ও উপযুক্ত। কাজেই, পুঁজিতন্ত্রে কেবলমাত্র একাকী শ্রমিক শ্রেণী-বিপ্লবী শ্রেণী। কিন্তু, তাই বলে পুঁজিপতি শ্রেণী যে মধ্যযুগীয় বর্বর , অন্ধকারের ভূত- সামন্ত শ্রেণীকে পরাজিত করেছে সেই পরাজিত শক্তি সুযোগ পেলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে না বা বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাজিত ও উচ্ছেদ করে নিজেদের পরজীবীতার সর্বাংগীণ সুযোগ নিশ্চিত করার মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল কুকর্মে সচেষ্ট হবে না তাতো হতে পারে না। আবার,নিম্নবিত্ত, ছোট হস্তশিল্প কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর , চাষী এরাও পুঁজির নিয়মেই ব্যক্তিগত মালিকানা হারায়। কিন্তু তারা মালিকানা

হারিয়ে তাদের অস্তিত্বটাকে হারাতে চায় না বলে ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় তারাও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে । অত:পর, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়ে বলেই এরা অর্থাৎ চাষীসমেত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তরা কেবলমাত্র সংরক্ষণশীল নয়, প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ- ঐতিহাসিক নিয়মেই বিলীয়মান ব্যক্তিমালিকানাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা ইতিহাসের এগিয়ে যাওয়ার ঐতিহাসিক গতিকে ব্যাহত-বিঘ্নিত করছে; অর্থাৎ ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে ঘুরাতে চায় ।

কিন্তু, ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘুরে না, কেবল সামনেই চলে। তাই এগিয়ে চলা ইতিহাসের সাথে মানব জাতির যে অংশ পা মিলায় তারা ইতিহাসের যাত্রা পথের যাত্রী অর্থাৎ প্রগতিশীল-বিপ্লবী; আর যারা অতীতে ফিরে যেতে চায়,পিছনে ঘুরাতে চায় ইতিহাসের চাকাকে এবং প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে ঐতিহাসিক গতির, ইতিহাসের মানদন্ডে তারা প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবী। কাজেই, বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধ-বৈরীতা ও সংঘাতের অনিবার্য পরিণতি-পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিলুপ্তির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শুধুই শ্রমিক শ্রেণী যোগ্য-উপযুক্ত বলেই বুর্জোয়া সমাজে কেবল মাত্র শ্রমিক শ্রেণীই বিপ্লবী শ্রেণী। তবে, প্রতিক্রিয়ার পরাজয় ও প্রগতির জয়- ইতিহাসের এই নিয়ম ও অমোঘ নিয়তি জানে যারা তারা যদি তা বুঝে ইতিহাসের গতির পক্ষভুক্ত হয়, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য অর্জন তথা ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্তির লড়াইয়ে শামিল হয় সামাজিক মুক্তির শর্তে নিজেরও মুক্তি হাসিলে তবে তারা শ্রমিক শ্রেণীর একজন হিসাবে বিপ্লবী- সমাজতন্ত্রী।

অত:পর, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার অধিপতি শ্রেণী যখন ঐতিহাসিক নিয়মেই ব্যক্তিমালিকানা বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় উপনীত হয়েছে, তখন ইতিহাসের নিয়ম মতো বুর্জোয়া যুগের বিপ্লবী শ্রেণী একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনে আরেকটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইতিহাসের গতিকে সামনে নিবে এটাই শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও করণীয়।

অতি উৎপাদনের সংকট-সমস্যায় সৃষ্ট মন্দায় নিপতিত হয়ে বিপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণী বস্তুতই হয়ে উঠলো ব্যক্তিমালিকানা বিকাশে প্রতিবন্ধক। শ্রমিক শ্রেণী ইতিহাসের নিয়মেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগঠিত করলো শ্রেণী সংগ্রাম। ফলে- বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন ও শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান দু'টোই সমান অনিবার্য হয়ে উঠলো। এই অনিবার্যতার অনিবার্যতায় আবিস্কৃত-উদ্ঘাটিত ও ব্যাখ্যাত হলো- ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক নিয়ম তথা ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্র; এবং পুঁজি'র গোপন রহস্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব। অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক নিয়মে বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন ও শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় তথা সমাজতন্ত্র বিষয়ক তথ্য-তত্ত্ব, সূত্র-ব্যাখ্যা ইত্যকার বিষয়- যা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত ও শনাক্ত হলো খোদ সহআবিস্কারক-ব্যাখ্যাতা ও তা কার্যকতরতায় নিয়োজিত কমিউনিস্ট এ্যাংগেলস কর্তৃক, দ্বিমত ছিল না মার্কসের। মুল ভূমিকায় ছিলেন মার্কস তাও বহুবার মনে করিয়ে দিতে ভুলেননি বিজ্ঞানী-কমিউনিস্ট মার্কসের বন্ধু যৌবনের প্রায় প্রথম পর্বেই মানুষ হওয়ার লড়াইয়ে নেমে পড়া বিপ্লবী এ্যাংগেলস।

অত:পর, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান তথা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য উপাত্ত ইত্যাদি প্রকারান্তরে বুর্জোয়া শ্রেণীর মৃত্যু সনদ ও মৃত্যু ফরোয়ানা হিসাবে উপস্থাপিত হল প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মুখে। তাই- বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্ট ও বুর্জোয়া সমাজের অপরিহার্য- শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্তকরণের অপচেষ্টার অংশ তথা শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় ঠেকাতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে মেতে উঠে পতনোন্মুখ বুর্জোয়া শ্রেণী। কাজেই বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল তৎপরতার সাফল্যে সূচনায় আবশ্যক হয়ে উঠে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে বিকৃত -দুষিত করা। এবং যথারীতি তারা তাই করলো। ফলে- পুঁজিতন্ত্রী সমাজ ও পুঁজিপতি শ্রেণী সম্পর্কে যেমন ভুল-ভ্রান্ত ও অসত্য বক্তব্য হাজির করা হল, তেমন শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তথা সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও বিকৃত -বানোয়াটি ও ভুয়া নীতি-বক্তব্য সুকৌশলে উপস্থাপিত হল।

এই কৌশলী উপস্থাপনার বিকৃত নীতি-সূত্র বাস্তবায়নে উপযোগী আরো নতুন নতুন ভুয়া-ভ্রান্ত ও দুষিত সূত্র- তত্ত্ব সূত্রায়নে -তত্ত্বায়নে ও কার্যকরণে প্রথম কার্যকর হোথা- লেনিন । যদিও নতুন নয়, তবু তারই জবানী ও ক্রিয়াদি দ্বারা বুঝানোর অপচেষ্টা হল- পুঁজিতন্ত্র, সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হলেও দুনিয়ার দেশে দেশে বুর্জোয়া বিকাশের সুযোগ এখনো শেষ হয়নি। অর্থাৎ, দুনিয়া বিজয়ী ও দখলকারী পুঁজিতন্ত্র এক দুনিয়ায় এক সমাজ নয়, বরং সমগ্র দুনিয়ায় অবস্থিত বটে নানান সমাজ; যা সত্যের অপলাপ মাত্র। তাছাড়া- পুঁজি তথা পণ্যের বদৌলতে ও জোরে দুনিয়ার সকল জাতিকে পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি তথা পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকরণে বাধ্য করে দুনিয়ার সকল জাতিকে আন্ত :নির্ভরতার সম্পর্কাধীন করায় ; এবং পুঁজিপতিদের সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর জাত-জাতিগত চরিত্র মুছে দিয়ে দুনিয়ার সকল জাতির জাতিগত পরিচয় বিলুপ্তির উপযুক্ত ভিত্তি তৈরী করে জাতিকে ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত করে জাতীয় মুক্তি কেবল অবান্তরই নয়, কার্যত অসম্ভব করেছে খোদ পুঁজিতন্ত্রই। তবু লেনিন ফতোয়া জারী করলেন যে, জাতিগত মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে নিপীড়ত বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমর্থন-সহযোগিতা করে কথিত জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হাসিল করাই শ্রমিক শ্রেণীর আশু করণীয়। উপরন্ত মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশ-কৃষক, কেবল রক্ষণশীলই নয়, উপরন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি তথা কমিউনিস্ট পার্টিকে দুরভিসন্ধিমূলে বলা হল শ্রমিক-কৃষকের পার্টি। তাই কৃষকের কাস্তে ও শ্রমিকের হাতুড়ী যোগে বানোয়াটিমূলে তৈরী করা হল ভুয়া কমিউনিস্ট পার্টির ভুয়া প্রতিক । কথিত জাতীয় বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে জোট ইত্যাদি গঠন করে রাষ্টিয় ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রিয় পুঁজিতন্ত্র কার্যকরণের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বের একচেটিয়া আধিপত্যে মজুরি দাসে পরিণত করে মজুরি দাসদেরকে শক্তহস্তে দমন-পীড়ন ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেনা ও রাজনৈতিক শক্তির সংমিশ্রণে তৈরী কথিত শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকের প্রতিনিধি কার্যত চরম স্বৈরতন্ত্রের সরকারকে উদ্দেশ্যমুলকভাবে সমাজতান্ত্রিক সরকার ও তদানুরূপ সরকার কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্রকে- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে উপস্থাপন করার কৌশলী হোথাও বটে " রুশী মার্কসবাদী" লেনিন।

মার্কসদের সূত্রায়িত- পুনরুৎপাদনের ফলশ্রুতিতে বুর্জোয়াদের সংকট-সমস্যা হেতু মন্দার পৌন:পুনিক প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি বিশেষত নেতৃস্থানীয়

দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর সম্মিলিত ক্রিয়ায় নয়, বরং লেনিনের বানোয়াটি তত্ত্বমূলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে বটে লেনিন-মাওদের মতো কতিপয় মহান-চিরঞ্জিত ও বিরল প্রতিভার মহান নেতা-শিক্ষক ও বীর ইত্যকার মহান ব্যক্তির মহান ত্যাগ-বীরত্ব ও শিক্ষা সমেত কথিত মহান আদর্শ তথা লেনিনীয় মতাদর্শে গঠিত- চরম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত একটি পার্টির নেতৃত্বে -কর্তৃত্বে যেকোনো দেশে, বিশেষত যেদেশে কর্তৃত্বে আসীন সরকার শাসন চালাতে অক্ষম-অযোগ্য, যেমন রাশিয়া, চীন ।

সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিশেষত কমিউনিস্ট ইস্তাহার, প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজম ইত্যকার পুস্তকাদিতে বিবৃত বা কমিউনিস্ট লীগ বা প্রথম আন্তর্জাতিকের এতদ্বিষয়ক নীতি কেন ভুল বা অকার্যকর বা গুরুত্বহীন তা বিবৃত না করে বা তদ্বিষয়ে কোনো ধরণের ব্যাখ্যা-যুক্তি উপস্থাপন না করে; এবং সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ না করে কমিউনিস্ট মার্কসকে দুরভিসন্ধিমূলে মহাগুরু সাজিয়ে গুরুর মতবাদ হিসাবে "মার্কসবাদ" নামীয় মতাদর্শ বানোয়াটিমূলে বানিয়ে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে দুষণ ও বিকৃত কার্যত অস্বীকার করে নিজেদেরকে গুরু মার্কসের উপযুক্ত ও যোগ্য শিষ্য ও চেলা-চামুন্ডা সাব্যস্তে ও গণ্যে আরো নানান মতবাদ, শিক্ষা বা চিন্তা ইত্যকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বানোয়াটি মতবাদ দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্তকরণের অপকৌশলে নানান দেশে কথিত কমিউনিস্ট পার্টি বানিয়ে বা চালান করে দেশ বিশেষের ক্ষমতা দখল করে তাকে বিপ্লব তথা নয়া গণতান্ত্রিক, জনগণতান্ত্রিক ইত্যকার নানান তকমাযুক্ত বিপ্লব নাম দিয়ে কথিত কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত-পরিচালিত কার্যত লেনিন-মাওদের মতো এক ব্যক্তির হুকুম-নির্দেশিত ও কর্তৃত্বাধীন চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে উপস্থাপনে সফল হয়েছে মহা সংকটে নিপতিত মরণাপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণী। রুশ-চীন, ভিয়েতনাম- কুরিয়া, কিউবা ইত্যকার দেশগুলি তদার্থে উপযুক্ত নজির এবং লাসাল-কাউৎস্কি, লেনিন-ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন-মাও, হোচি- কিম, টিটু-চসেস্কু, হোক্সা-পলপট, ফিদেল-চে' গং এন্ড কোং এসকল বিকৃতি-দুষণ ও দোষণীয় দুস্কর্মের হোথা।

উপরন্ত, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির কাজ শ্রমিক শ্রেণীর নিজেরই কাজ রুপ বক্তব্য মার্কস-এ্যাংগেলস বহুবার উপস্থাপন করা সত্ত্বেও মার্কসদের অনুরূপ মতামতকে ভুল বা ভ্রান্ত বা অযৌক্তিক প্রমাণ না করে রুশী মার্কসবাদী লেনিন বা দুনিয়া খ্যাত মার্কসবাদী বিপ্লবী মাও বা হোচি, ফিদেল-চে'রা কেন সেনাবাহিনীর সহযোগে বা পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রের সাহায্য সহযোগীতায় রাষ্ট্র বিশেষের ক্ষমতা দখল করলেন এবং দখলকৃত ক্ষমতাকে সুসংহকরণে পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা নিলেন তার কোনো উপযুক্ত যুক্তি তারা হাজির করেননি। উল্লেখ্য-সেনাবাহিনী মুল্য বা উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন করে না, বরং উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারীদের তথা পরজীবীদের পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে সৃষ্ট ও বিদ্যমান বলেই অতীতেও যেমন খুনাখুনির পেশাজীবী হিসাবে সেনাবাহিনী শ্রমজীবী মানুষের ভয়-ভীতি ও শংকার কারণ ও কারক তেমন বর্তমানেও শ্রমিক শ্রেণীকে দমন-পীড়নে রাষ্ট্রিক উপাদান হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মুল্য ভোগী। অত:পর, উদ্বৃত্ত-মুল্য ভোগী বা উদ্বৃত্ত-মুল্যের সুযোগ-সুবিধাভোগী গোত্র বা পেশাধারী কি পেশার শর্ত অটুট রেখে বা পেশাগতভাবে উদ্বৃত্ত-মুল্য তিরোধানে তথা ব্যক্তিমালিকানা বিলীন ও

বিলোপে বা কেনা-বেচা অদৃশ্যমানে তথা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হাসিলে অর্থাৎ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় যোগ্য ও উপযুক্ত হতে পারে?

না। তাছাড়া, সেনাবাহিনীর সহযোগে দখলকৃত ক্ষমতার বৈধতা লাভে জনগণতো বটেই এমনকি শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও খোদ লেনিন কেন ইতো:পূর্বেকার স্বীয় নিদানিকৃত নিদান ও ওয়াদা ভংগ ও অমান্য করে রুশ ক্ষমতা আকঁড়ে থাকলেন তার যেমন উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যাখ্যা স্বয়ং লেনিন দিতে পারেননি তেমন সমাজতন্ত্রে কি কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি তথা লেনিনই রুশ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি গুচ্ছ তথা রাষ্ট্রিক সংবিধান প্রণয়ন করবেন বা চীনের শ্রমিক শ্রেণী কি কেবলই মাও চিন্তা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তদুপরি লেনিন-মাওরা যখন খুশি তখন এবং যেমন খুশি তেমন সংবিধান চালু ও বাতিল করবে ? অথচ, তারা তাই করেছে। অত:পর, সমাজতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্র কি ওয়ানম্যান শো? তবে এমনটাই যদি সমাজতন্ত্র হয় তবে হাম্মুরাবী, মুসা ইত্যকার নেতা-শিক্ষক ও গুরুদের নির্দেশাবলী সমেত তাদের রাজত্ব কেন সমাজতন্ত্র বলে চিহ্নিত হবে না তারও সদোত্তর লেনিন-মাওরা তো নয়ই এমনকি তাদের উপযুক্ত শিষ্যরাও আজো দেওয়ার গরজ বোধ করেনি।তবু, লেনিন-মাওরা সমাজতন্ত্রী !! ??

অত:পর, শ্রম-পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র, পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণী, শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ক তথা পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর সম্পর্ক বিষয়ে সুস্পষ্ট, সুবিস্তৃত ও যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সূত্রায়ন ও তত্ত্বায়ন তথা শ্রমই মূল্যের স্রষ্টা তাই উদ্বৃত্ত-মুল্য অর্থাৎ পুঁজি সৃষ্টি, সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে আবশ্যকীয় নীতি- উপনিবেশিকতার মাধ্যমে পুঁজির বৈশ্বিক কর্তৃত্ব অর্জন; অনুরূপ বৈশ্বিক কর্তৃত্বের কারণেই জাতিগত আন্ত :নির্ভরতায় দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির অধীনস্ত হওয়া, শ্রমিক শ্রেণীর আন্ত র্জাতিকতার উদ্ভব, এবং চূড়ান্তভাবে পুঁজির স্ববৈরীতা ও স্ববিরোধীতার পরিণতি-সমাজতন্ত্র; এবং সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানার অবসান, অর্থাৎ পণ্য বেচাকেনার অবসান, তথা পুঁজির অন্তর্ধান,ফলে উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানা অর্জন, অর্থাৎ রাষ্ট্র বিশেষ নয় দুনিয়ার সকল মানুষ সম্মিলিতভাবে ভূমি তথা ধরিত্রী সমেত সকল উৎপাদন উপায়সমূহের মালিক হওয়া এবং শ্রম- শ্রেণী বিশেষের ধর্মের গন্ডী অতিক্রম করে স্বীয় গুরুত্বের স্বীকৃতিসমেত সার্বজনীনতা লাভ; শ্রেণী-রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিনাশ- বিলোপ ও অবসান;সকলের কার্যকর অংশগ্রহণে সকলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন সহ সকল সামাজিক ক্রিয়াদি সংঘটন-সম্পাদন ও সমন্বয় সাধনে একটি বিশ্ব সমিতি প্রতিষ্ঠা; এবং শ্রমের অনুরূপ সার্বজনীনতায় প্রত্যেক মানুষ সমমর্যাদায় উন্নীত হয়ে প্রত্যেকে একটি মুক্ত বিশ্বের মুক্ত-স্বাধীন বাসিন্ধা তথা মালিক- অমালিক, অভিজাত-অনাভিজত, বুদ্ধিজীবী-অবুদ্ধিজীবী, নেতা-অনুসারী, গুরু-শিষ্য, জাত-জাতি, ভাষা-ধর্ম,লিংগ-বর্ণ ইত্যকার যাবতীয় বৈরীতা-বৈষম্যের পরিচয় মুক্ত বা তাদার্থের চিন্তা-চেতনা বিমুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকেই স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ বলেই মানুষে মানুষে সাম্য হাসিলকারী মানবিক সমাজই হচ্ছে পুঁজি'র পরিণতি-সমাজতন্ত্র।কাজেই, পুঁজিতন্ত্রই হচ্ছে সাম্যতন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং,সাম্যতন্ত্র হচ্ছে পুঁজি'র পরিণতি অর্থাৎ মানবজাতির ভবিতব্য ।

পুঁজি ও পুঁজিহীন সমাজ তথা পুঁজিতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্র সম্পর্কে এমনটাই আবিস্কার-ব্যাখ্যা বটে মার্কস-এ্যাংগেলস উভয়ের।তাছাড়া, সাম্যতন্ত্রী যুগের মানুষেরা নিজেদের সার্বিক ক্রিয়াদি সম্পাদন ও তদ্বিষয়ে সামাজিক নিয়ম-নীতি ও রীতি ইত্যাদি নিজেরাই ঠিক-ঠাক করবে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হিসাবে । এ যুগে অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রে তথা পুঁজির পরাধীনতা ও দাসত্বের যুগে সেই সকল নীতি-নিয়ম ইত্যাদি যথার্থভাবে প্রণয়ন করার সাবির্ক সুযোগ যেমন নাই তেমন ঐ সকল বিষয়ে কেবল নীতিগত মতামত উপস্থাপন ছাড়া সুবিস্তৃত ও পরিপূর্ণকরণের আবশ্যকতা নাই। তাই, পুঁজিতন্ত্রের বিলুপ্তিতে সমাজতন্ত্রের নীতি-নিয়ম ইত্যকার বিষয়াদি সুসম্পূর্ণকরণের প্রচেষ্টা মার্কস-এ্যাংগেলসরা যথার্থভাবেই করে নাই ।

কিন্তু, লেনিনদের এদ্বিষয়ক মতবাদ ও ক্রিয়াদি যে মার্কসদের আবিস্কৃত-বিবৃত ও ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান তথা উক্তরূপ বক্তব্যাদির বিকৃতি ও দুষণ তাওতো এখন সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত।

ফলে- পুঁজির স্রষ্টা শ্রমিক শ্রেণী সহ মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে পুঁজি, পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি জন্মালো। তাতে ক্ষতি হল শ্রমিক শ্রেণীসহ মুক্তিকামী মানুষের, সুবিধা পেল মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র ও বিপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণী। বুর্জোয়া মাত্রই শোষক, অর্থাৎ শ্রমিকের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারী। তাই, স্বদেশ-স্বজাতি যে নামেই হোক নিপীড়িত বুর্জোয়াদের সমর্থনের অজুহাতে বিদেশী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে দেশীয় বুর্জোয়াদের পুঁজির পরিমাণ বর্ধিত হওয়ার সুযোগ বাড়ে বটে। তাই বলে দেশী-বিদেশী বুর্জোয়ারা পরস্পর চিরকালীন বা মিমাংসার অযোগ্য শত্রুতার সম্পর্কাধীন নয় মোটেই, বরং পূর্বাপার যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত বা পরাজিত ও জয়ীরা আবারো পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কে তথা স্ববৈরীমুলক যুগপৎ সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় নি তা তাতো নয়। তাছাড়া- কথিত স্বাধীন দেশে শ্রমিক শ্রেণী আরো বেশীমাত্রায় শোষিত-নিপীড়ত হয় স্থানীয় পুঁজিপতিদের পুঁজি বৃদ্ধির হারাহারিতে।

আবার যে শ্রমিক শ্রেণী বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের কারণে জাতিগত চরিত্র বিমুক্ত হয়ে স্বদেশ হারিয়েছে তারা নিজেদের বিশ্বটি জয়ের মাধ্যমে নিজ শৃংখল হারাতে তথা পুঁজির শোষণ মুক্ত হতে সক্ষম ও উপযুক্ত সেই শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় ইতিহাস অর্থাৎ পুঁজির জন্ম-বিকাশ তথা শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম-বিকাশ ও মুক্তি বিষয়ে ভুয়া-ভ্রান্ত ও কল্পিত-বানোয়াটি তথ্য-তত্ত্ব ও ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বরে ডুবিয়ে কথিত স্বদেশ-স্বজাত্বির বেড়া-গন্ডীতে আটক-বন্দী, বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করে শ্রমিক শ্রেণীর স্বীয় শ্রেণী মুক্তির পথ হতে খোদ শ্রমিক শ্রেণীকে দুরে সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরী করা সহ বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী শত্রু -প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী ও শক্তির সহযোগী করার লেনিনবাদী কুযুক্তির সুবাদে পতনের প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়েও উচ্ছেদ হওয়ার সামুহিক বিপদ হতে সাময়িক রেহাই পায় বিপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণী।

বিশ্ব জয়ী পুঁজিতন্ত্র নিজেই প্রমাণ করেছে বিশ্ব একটি এবং সমগ্র বিশ্বজুড়ে সমাজও একটি অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্র। তাই, পুঁজিতন্ত্রের অধিপতি শ্রেণী পুঁজিপতিদের সাথে পুঁজিহীন শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধ-বৈরীতার পরিণামে প্রতিষ্ঠিত-সমাজতন্ত্রও একটি বৈশ্বিক সমাজ। তাছাড়া, কারাখানা বিশেষের অংশীদারদের শরিকী ঝগড়া-বিবাদে যেমন শ্রমিকের অংশ

গ্রহণ করার যৌক্তিকতা নাই, তেমন কারখানা বা কোম্পানী বিশেষের মালিকানা হস্তান্তর বা পরিবর্তন বা একাধীক বা বহু কোম্পানী একত্রিত হয়ে নতুন কোনো কোম্পানীতে রূপান্তরিত হলে বা মাল্টি/ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানীতে পরিণত হলে তাতে পূর্বাপর কর্মরত শ্রমিকরা শ্রম শক্তি বিক্রেতা বৈ অন্য কিছু নয়, বা কেবলই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী মানবকি যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয় এবং শুধুমাত্র সামাজিক মালিকানা ব্যতীত মাকিলানার ধরণ যাহাই হোক না কেন তা শ্রমিক কেবলই শোষিত বৈ মুক্ত নয়। তাই, সামাজিক মালিকানার স্বপক্ষে ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ ছাড়া পুঁজিতন্ত্রের আন্ত:বিরোধ-বৈরীতায় শ্রমিক শ্রেণীর অংশ গ্রহণের যৌক্তিক কারণ নাই বা পুঁজিতন্ত্রকে অটুট-অক্ষুন্ন রেখে বা কিঞ্চিত কাঁট-ছাঁট করে বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে পুঁজিতন্ত্র রক্ষণ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে দুর্ভোগ-দুর্দশা বাড়া বৈ শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হাসিলের কোনো সুযোগ নাই ।

তৎসত্ত্বেও তথাকথিত জাতীয় মুক্তি অর্জনে উপনিবেশিকতা বিরোধীতায় পূর্বাপর পুঁজির বিশ্ব দখলাভিযানে পতিত-পরাজিত ও পরাভূত প্রাক পুঁজিতন্ত্রী শোষক গোষ্ঠী যখন পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানান প্রতিক্রিয়া তথা পুঁজিতন্ত্র বিরোধী সংঘাত-সংঘর্ষ বা বিদ্রোহ-যুদ্ধ ইত্যাদি সংগঠিত ও সংঘটিত করেছে সেসকল প্রতিক্রিয়াশীল দুস্কর্মকে যেমন দেশপ্রেমিক বীর-নায়কদের মহান সুকর্ম রূপে জাহির করেছে তেমন উপনিবেশের বুর্জোয়ারা যখন নিজেদের স্বার্থে তথাকথিত জাতীয় মুক্তি ইত্যাদির ভুয়া মাতম তুলে তথাকথিত জাতীয় পুঁজির বিকাশ সাধনের ধুঁয়া তুলে উপনিবেশ বিরোধী লড়াই করাকে দেশপ্রেমিক কর্তব্য হিসাবে বানোয়াটিমূলে উপস্থাপন করে দেশী-বিদেশী বুর্জোয়ার বিরোধ-বৈরীতা ও সংঘাত-যুদ্ধকে মহামান্বিত ও গৌরবান্বিত করে ঐ সকল লড়াইয়ে নিহতদেরকে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সাজিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে সেই সকল কথিত বীর পূঁজার ঘৃণ্য ধারণায় সম্পৃক্ত করার হাজারো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করছে লেনিনবাদী গুরু ও মোড়ল-মাতুব্বররাও।

উল্লেখ্য - শ্রমিক শ্রেণীর স্রষ্টা ও দুশমন বটে পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির শর্তে। তাই বলে বিদেশী পুঁজিপতি চলে গেলেই স্বদেশী বুর্জোয়ার রাজত্বে যেমন শ্রমিক শ্রেণী মুক্তি অর্জন করতে পারে না তেমন সম্রাট-রাজা বা বাদশাদের বর্বর রাজত্ব তথা মধ্যযুগীয় অন্ধকার যুগে শ্রমিক শ্রেণীতো নয়ই এমনকি বুর্জোয়ারাও আর কখনো ফেরৎ যেতে পারে না এবং কোথাও যায় নাই বা যাওয়ার কোনো সুযোগ আদৌ নাই। কারণ-পণ্য অর্থনীতির আধুনিক শিল্প কারখানা ও উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নততর বিশ্ব ব্যবস্থা হতে পশ্চাদপদ- ভূমি দাসত্বের স্থানীয় ও সংকীর্ণ জাতিগত বা স্বনির্ভর অর্থনীতিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নাই। ইতিহাস পিছনে নয়, হাঁটে বটে সামনে। মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা তাই বলে যেমন খুশি তেমন ভাবে নয় বরং ইতিহাসের নিয়মেই বলা চলে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের নিয়ম-সূত্র মেনে চলে মানুষ।

উল্লেখ্য- ভারতীয় পুঁজিপতিদের কার্যত পুঁজিতন্ত্রের সেবক চাতুরালীতে ওস্তাদ গান্ধীর ভুয়ামি তথা চরকার গুণকীর্তন করে ধোঁকা দিয়ে দেশীয় পণ্যের মোহাচ্ছন্নতায় দেশপ্রেমের আবেগময়তায় আপ্লুতকরণের মাধ্যমে ভারতের তথা ভারত-পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণীসহ শ্রমজীবী মানুষকে জাতি-ধর্মের বিভ্রম- বিভ্রান্তির মায়াজালে আটক করে বিভাগপূর্ব ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী চরিত্র বিসর্জনে সফল্য লাভে

লেনিনবাদীরা সমেত প্রথাগত ভারতীয় বুর্জোয়ারা কথিত উপনিবেশ বিরোধী যুদ্ধে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে শামিল করা সত্ত্বেও কথিত স্বাধীন-সার্বভৌম ভারত বা পাকিস্তান কি আদ্দিকালের চরকার রাজত্বে ফিরে যেতে পেরেছে, অথবা দুনিয়ার কোথাও কি অদ্যাবদি এমন নজির সৃষ্টি হয়েছে?

কেবল ভিন গ্রহই নয়, বরং সৌরজগতের বাহিরে অন্যান্য নক্ষত্র বিশেষত সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র-ফ্লক্সিমার আওতায় ভবিষ্যতে মানববসতি স্থাপনের প্রচেষ্টায় নিরন্তন কর্মরত শিল্পোন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা । অথচ, "দুনিয়ার মজুর এক হও" এই নীতিকথা সদাসর্বদা আওড়িয়ে লেনিনবাদীরা , স্ববিরোধীভাবে দাবী করছে তারা অর্থাৎ লেনিনবাদী কমিউনিস্ট মোড়লরা নাকি দুনিয়া সেরা দেশপ্রেমিক! অথচ, শ্রমিক শ্রেণীর দেশ নাই, হারিয়েছে তারা জাতিগত পরিচয় ও চরিত্র; এবং সর্বত্র কেবলই তারা অর্থাৎ শ্রমিকরা -শ্রম শক্তি বিক্রেতা মজুরি দাস। তাইতো সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ শ্রেণীগতভাবে গঠিত তথা শ্রেণীমুক্তির উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়ে আন্তর্জাতিকতার চিন্তা-চেতনা, শক্তি ও সংহতিতে শক্তিমান- বলবান ও সংঘবদ্ধ হয়ে; এবং সংঘবদ্ধভাবে বৈশ্বিক পরিসরে সংঘটিত বিশ্ব বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাজিত ও পরাভূত করে শ্রমিক শ্রেণী হারাবে তার শৃংখল,জয় করবে তার দুনিয়া।

পুঁজির বিপ্লবী ভূমিকায় পুঁজিতন্ত্রী ধাঁছে বিশ্ব গড়তে অর্থাৎ বিশ্বময় পণ্যের বাজার কায়েমে তথা পণ্য ভোগ-ব্যবহারের এক সার্বজনীন ব্যবস্থা কার্যকরণে ক্রিয়াশীল বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণীর নিকট পরাজিত দেশগুলির স্থানীয় সহযোগী-সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীও কম-বেশ পুঁজির মালিক বনেছে ইতিহাসের নিয়মে।

কিন্তু, পুঁজি-পণ্যের বিশ্ব দখলের পর সঞ্চালন ও বিপনন সমস্যা ও সংকট ছিল পুঁজি-পণ্যের ললাট লিখন। তাই, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে চিরকালীন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাধ্য, জন্ম সূত্রে দুশমনিতে লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণী উপনিবেশ দখল-বেদখলে যেমন যুদ্ধ-সংঘাত করতে গিয়ে জাতীয় মুক্তি ইত্যকার ভুয়া রাজনীতি'র কচকচানি করেছে তেমন উপনিবেশের উঠতি বুর্জোয়ারাও স্বীয় পুঁজির অস্থিতের স্বার্থে অর্থাৎ পুঁজির সঞ্চালন ও পণ্যের বিপননের প্রয়োজনে বিদেশী পণ্য বর্জন সহ বিদেশী পুঁজিপতি তাড়ানোর গরজে এত্তোসব দেশপ্রেম-মাতৃভূমি প্রেম, মাতৃভাষা প্রেম, ধর্ম প্রেম, দেশীয় পণ্য প্রেম ইত্যকার নানান প্রেমের নানান জারি-সারি ও গীত ইত্যাদি ঢোল-মাদল ও ডুগ-ডুগি বাজিয়ে পরিবেশন করে তদ্বিষয়ে জনউন্মাদনা সৃষ্টি করে- পুঁজিতন্ত্র নয়, বরং কতিপয় বিদেশী পুঁজিপতিকে আপামর জনসাধারণ তথা দেশীয় পুঁজিপতি, ও শ্রমিক শ্রেণীসহ শ্রমজীবী-মুক্তিকামী মানুষের দুশমন সাজিয়ে কার্যত -শ্রম, শ্রম শক্তি, শ্রম শক্তি কেনা-বেচা, পণ্য, পণ্য উৎপন্নের হেতুবাদে মুল্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি উৎপন্ন; এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকারী বলেই পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত শ্রমিক শ্রেণীর জন্মগত বিরোধ-বৈরীতা; এবং অনুরূপ বৈরীতার পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম-বিকাশ ও পরিণতি অর্থাৎ শ্রমিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি বিষয়ে ভয়ানক ভ্রান্তি- বিভ্রান্তি ছড়াতে সফল হয়েছে। তাতে কতিপয় বিদেশী পুজিপতি সাময়িকভাবে উপনিবেশ বা দেশ বিশেষ পরিত্যাগ করলেও পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রের আধিপত্য-কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিলুপ্ত হয়নি। বরং ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত বুর্জোয়া শ্রেণী পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজকে

রক্ষায় বিজয়ী বুর্জোয়াদের আধিপত্যে ও কর্তৃত্বে সমগ্র দুনিয়ার সকল পুঁজির স্বার্থে সমগ্র দুনিয়ায় সকল পুঁজির সম্মিলিন ঘটিয়ে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র তথা বুর্জোয়াদের বৈশ্বিক কর্তৃত্বের ভান্ডার 'বিশ্ব মুদ্রা ভান্ডার' সৃষ্টি ও কার্যকর করে বুর্জোয়ারা নিজেরাই ঐতিহাসিক নিয়মেই নি:শেষিত ও অপ্রয়োজনীয় উপনিবেশিকতা নীতির পরিসমাপ্তি - অবসান ঘটিয়ে উপনিবেশগুলোকে তথাকথিত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব প্রদানের ছুতায় কার্যত দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে নানান দেশ-জাতির গন্ডীতে আটক-আবদ্ধ করে বহুধাভাগে ভাগ-বিভাগ ও বিভক্ত করে শ্রমকি শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাকে পদদলিত ও ভুলিয়ে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি গড়ে উঠার কার্যকর উপাদান বিশ্বজনীনতার উপযুক্ত প্রতিবন্ধক -শ্রেণী চৈতন্যহীনতার কর্দমাক্ত জলাশয়ে ডুবিয়ে এখনো টিকে আছে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী।

কিন্তু, পুঁজির জন্মদোষেই সংকট হতে রেহাই পায়নি প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী। তাইতো পুন:পুন সংকটে নিপতিত হয়ে পৌন:পুনিক মন্দার চক্রে হাবু-ডুবো খাছে পুঁজিপতি শ্রেণী। টিকেনি লেনিন-মাওদের রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী- " সমাজতন্ত্র "।

বরং, লেনিনের প্রতিষ্ঠিত কেজিবি'র কর্মকর্তা পুতিন যেমন এখন প্রায় ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক তেমন মাওয়ের চীনে ১০ লক্ষাধিক কোটিপতি অলংঘনীয় ব্যক্তিমালিকানার সাংবিধানিক সুযোগে আরামছে হারামের অর্থ -কড়ি কামাচ্ছে দেদারছে অর্থাৎ শোষণ করছে চীনের মজুরী দাসদের। তাইতো লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, লেনিনীয় পার্টির ভাগ-বিভাগ ও অবলুপ্তি ইত্যকার কারণে প্রকৃত তথ্য-সত্য জানতে অনুসন্ধানী ক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছিলাম সাম্য প্রত্যাশী আমরা কতিপয় লেনিনবাদী ।

অত:পর, সত্য ও যথার্থ যা কিছু আমরা পেয়েছি- তাহাই আমরা প্রকাশ করছি। তাতে হয়তো আমাদের গলতি ও ভ্রান্তি আছে, আছে ভাষাগত সংকীর্ণতা-সীমাবদ্ধতা। তাছাড়া বক্তব্য প্রকাশে নাই উপযুক্ত ও যথার্থ শব্দ; তদুপরি বহুদিনের চর্চাকৃত লেনিনবাদী কুঅভ্যাসের ধারাবাহিকতার বদৌলতে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকাটা অস্বাভাবিক।

এমন অনুসন্ধানী কর্মতৎপরতায় অবগত হলাম যে,পুঁজিপতি শ্রেণীর বর্ণচোরা স্বার্থান্বেষী চক্র লেনিন-মাওরা যেমন পুঁজি, পুঁজিপতি, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ, শ্রমিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি- সমাজতন্ত্র তথা সাম্যতন্ত্র সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে তেমন ঐ সকল ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক ভ্রান্তির আবশ্যকতায় তাদের দুস্কর্মের ষোলকলা পরিপূরণের দুরভিসন্ধিতে লেনিনবাদীরা কারসাজি করেছে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্ত াহারতো বটেই এমনকি পুঁজি'র প্রথম বাক্যটিকেও বিকৃত করেছে ভাষান্তরকরণে,তখন লেনিনবাদ-মাও চিন্তা ইত্যকার বিকৃতি ও দুষণ মুক্ত তথা মার্কস-এ্যাংগেলসদের অবিকৃত সাহিত্যের অপরিহার্যতা, উপযোগিতা ও গুরুত্ব আমরা অনুভব করি। উল্লেখ্য- ইতোপুর্বেই আমরা লেনিনবাদ-মাও চিন্তা ইত্যকার বিজ্ঞান বিরোধী কদাকার আবর্জনা বিশেষ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি ।

জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, জাতীয় মুক্তি, উপনিবেশিকতার বিরোধীতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই ইত্যকার রাজনৈতিক বোলচালে লেনিন ও লেনিনবাদীরা পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজির শোষণকে আড়াল করে বা দৃশ্যপটের আবডালে নিয়ে কৌশলে স্বার্থ রক্ষা করছে পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বটে। তাতে যতোটামাত্রায় সুবিধা পাচ্ছে মৃতবৎ পুঁজিতন্ত্র ঠিক

ততোটা মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। উপরন্ত পুঁজিপতি শ্রেণীর সমাজতন্ত্র তথা দুনিয়ার পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণ ও পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য ২য় বিশ্ব যুদ্ধ বিজয়ী পুঁজিতন্ত্রী মোড়লদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট- বিশ্ব ব্যাংক, আই.এম.এফ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যকার বৈশ্বিক কর্তৃত্বকারী প্রতিষ্ঠানাদি গঠন ও কার্যকর হওয়ার পরও এককেন্দ্রীক বিশ্ব বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয় বরং লেনিনীয় অন্ধত্বে , মোহে ও মোহচ্ছন্নতায় লেনিনবাদীরা কেবলই হাওয়াই যুদ্ধ করেছে বটে কথিত সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা নয়া উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারণবাদ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং উপরন্ত হাস্যকরভাবে আধা-ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের কল্পিত ভূতের বিরুদ্ধেও। তাতে- শ্রম শক্তির ক্রেতা হিসাবে শ্রমিকের শোষক দেশীয় বা স্থানীয় বা স্বজাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু নয়, বরং মিত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়ে কার্যত শত্রু হওয়া সত্ত্বেও স্বজাতি বা স্বদেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী কথিত জাতীয় বুর্জোয়া হিসাবে মুক্তি প্রত্যাশী শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ হামলা-আক্রমণের শিকার বা তদার্থে লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে সহজেই অব্যাহতি পেয়ে যাচ্ছে কেবল নয়, বরং লেনিনবাদীদের উল্লেখিতরূপ লড়াইয়ের মুখরোচক রাজনৈতিক বুলি যথা-দেশপ্রেম, ভাষা প্রেম, জাতিপ্রেম, লিংগপ্রেম ইত্যকার নানান ক্ষতিকর-বিষাক্ত বচনামৃতে নিমজ্জিত শ্রমিক শ্রেণী এমনকি চিন্তা-চেতনায়ও দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের গন্ডিতে আটক-আবদ্ধ থেকে স্বীয় শ্রেণীর শ্রেণী চৈতন্যের ভান্ডার আন্তর্জাতিকতার প্রতিবন্ধক হিসাবে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক-ঐক্য ও সংহতির পথে বাঁধা হিসাবে ক্রিয়াশীল । তাতে -সুবিধা হচ্ছে প্রত্যেক দেশের পুঁজিপতিদের সহ সামগ্রীক পুঁজিতন্ত্রের। তৎসত্ত্বেও পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন বৈশ্বিকভাবে যুগপৎ প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার স্ববিরোধী আন্তঃসম্পর্কাধীন জটিল সমস্যাক্রান্ত তেমন পুঁজিতন্ত্রও ভয়ানকভাবে সংকটাপন্ন।

বুর্জোয়ারা যতোভাবে সম্ভব শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত-প্রবঞ্চিত করবে, এটাই পুঁজি ও পুঁজিপতির ধর্ম ও কর্ম। তাই, প্রথাগত বুর্জোয়ারা নিজ নিজ সুযোগ-সুবিধা হাসিলে রাজনৈতিক কার্যাদিতেও ব্যবহার করে শ্রমিকশ্রেণীকে, এবং শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত ও বিভাজন এবং বিভ্রান্তকরণে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি মোহচ্ছন্নতা ও প্ররোচনা দেওয়াসহ উদ্বৃত্ত-মূল্যের ছিটে-ফোঁটা কিছু দিয়ে কাউকে কাউকে নেতা-মোড়ল সাজিয়ে-বানিয়ে ঐ সকল দুষ্ট-দুর্বৃত্ত ট্রেড ইউনিয়নিষ্টদের সন্ত্রাসী রাজত্বে বন্দী করা সহ আটক রাখতে চায় দেশ-জাতির ভুয়া বন্দনায়। অন্যদিকে, বর্ণচোরা বুর্জোয়া তথা লেনিনবাদী, মাওপন্থী, ফিদেল ভক্ত, শেভজ অনুরাগী গয়রহ সকলেই যারপর নাই চেষ্টা-তবদির করে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর একাংশকে পথভ্রষ্ট-শ্রেণী চৈতন্যহীন তদুপরি জীবন-জীবিকা সম্পর্কে লেনিনবাদী অন্ধত্বের কানাগলিতে হাঁটাতে সাময়িকভাবে হলেও সফল হয়েছে। প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের প্রভুশ্রেণীর রাজনীতি তথা ধর্মের আশ্রয়েও টিকে থাকার প্রচেষ্টারত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী নানান কলা-কৌশলে তাদেরই পুঁজির শোষণ-পীড়ন ও যন্ত্রণায় পীড়িত ও যন্ত্রণাগ্রস্তার আপাত ও দৃশ্যত উপযুক্ত প্রতিকারহীনতার হেতুবাদে হতাশাগ্রস্ত বহু শ্রমিককে নিজের শ্রম নয়, বরং ভাগ্য ও ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হতে প্ররোচিতকরণেও সফল হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী। ঈশ্বর বিমুক্ত লেনিন যেমন ছিলেন ধর্মের পূঁজারী তেমন লেনিনবাদীরাও নানান ধর্মীয় নানান আচার-আচরণে

অভ্যস্ত ও তদানুরূপ ক্রিয়াদির মাধ্যমে প্রবঞ্চিত ও বিভ্রান্ত করছে বটে শ্রমিক শ্রেণীকে। তাতেও সুবিধা কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীর। তাইতো মরণ দশায় উপনীত হয়েও পুঁজিতন্ত্র বেঁচে-বর্তে আছে অতিমাত্রার বার্ধক্যের জ্বরাগ্রস্ততার ভীষণ ও ভয়ানক উপকরণ-উপাচার সমেত শ্রমিক শ্রেণীর উপর ততোধিক নানানমুখি হামলা-আক্রমণ ও পীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে।

লেনিনবাদীদের অমন দুস্কর্মের ফলে- কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি, বিকৃতি ও দুষণ ছড়িয়েছে কেবল শ্রমিক শ্রেণী নয়, বরং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্তে স্বীয় মুক্তি প্রত্যাশী অশ্রমিকদের মধ্যেও। এক কথায় পুঁজিতন্ত্রের বিরোধীপক্ষকে বিভ্রান্ত করণে আপাত সাফল্য লাভ করেছিল- লেনিনবাদ,মাও চিন্তা, কিমের জুসে আইডিয়া, ফিদেলের- আত্মবিশ্বাসী কতিপয়ের নেতৃত্বে লিবারেশন তত্ত্ব, চারুবাবুদের খতম লাইন, শেভেজের লাল-হলুদ জামার সমাজতন্ত্র ইত্যকার বিষাক্ত জঞ্জাল ও আবর্জনা দ্বারা।

যে ব্যবস্থার আওতায় শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হবে সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপ অবশেষে আবিস্কার করেছিল প্যারী কমিউন। মার্কস এবং ১ম আন্তর্জাতিক তা কবুল করেছিলেন। মূলত সমাজের ইতিহাস, পণ্য ও পুঁজি তথা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিষয়াদি অভিনেশসহ অধ্যায়ন-বিশ্লেষণ, সূত্রায়ণ-তত্ত্বায়ন এবং তত্ত্ব সমুহ কার্যকরণে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্মে একনিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণকারী মার্কস-এ্যাংগেলস, দু'জনেই পুঁজি'র পরিণতি- সমাজতন্ত্র বিষয়ে মৌলিক নীতি-সূত্র ও প্রাথমিক কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন। অবশ্য এক জনমে এত্তো কিছু করার সুযোগ সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ঈর্ষণীয়।

নানান কারণে কমিউনিস্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি- বুর্জোয়াদের নিকট পরাজিত হয়েছে। তবে পরিপূর্ণ কমিউনিস্ট নীতিতে পার্টি গঠন করতে না পারার খেদ ছিল খোদ এ্যাংগেলসের। তাছাড়া, লেনিনবাদের অন্ধত্ব ও মূঢ়তার যুগে কমিউনিস্ট লীগ বা ১ম আন্তর্জাতিকের নিয়ম-নীতি ইত্যাদিও গুরুত্বহীন, অস্বীকৃত ও অকার্যকৃত হয় এবং দাসত্বের তথা লেনিনীয় স্বৈরতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নিয়ম-নীতি ভ্রান্তভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ম-নীতি হিসাবে চিহ্নিত হয় । তাতে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কেও ভয়ানক ভ্রান্তি জন্ম হয়। কবরপাড়ে উপনীত মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের অসহ্য ও যন্ত্রণাময় এবং দম বন্ধ হওয়া দোষণীয় অবস্থা হতে পরিত্রাণে তথা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অর্জনে বিকল্পহীনভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে- পুঁজিতন্ত্র, কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিজম সম্পর্কে সৃস্ট ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ও বিকৃতি ইত্যকার দোষণীয় দুষণ দুরীভূতকরণ বিকল্পহীন শর্ত।

সেজন্য,মার্কসের 'পুঁজি' সমেত মার্কস-এ্যাংগেলস রচিত অবিকৃত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য পাঠ-পর্যালোচনা অপরিহার্য। এমনকি, লেনিনবাদীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুবাদ দোষে দোষণীয় মার্কসদের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বিকৃতি চিহ্নিত-শনাক্তকরণে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃস্টিভংগিও অপরিহার্য। অনুরূপ অপরিহার্যতার আবশ্যকতায় 'পুঁজি' সহ মার্কস-এ্যাংগেলসদের রচিত অবিকৃত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য পাঠে আবশ্যকীয়দের আবশ্যকীয় আগ্রহোদ্দীপনে মার্কসদের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের ভিত্তিতে 'পুঁজি'র পরিণতি' রচিত হল। তবে ভুল-ত্রুটি সংশোধনে কেবলমাত্র পুঁজিতন্ত্র বিরোধীদের প্রমাণিত বক্তব্য বা প্রমাণযোগ্য মতামত সাদরে আমন্ত্রিত।

পুঁজি নিজ বিকাশের স্বার্থে সমগ্র দুনিয়া দখল -জয় ও একত্রিত করে দুনিয়ার সকল মানুষকে একটি বৈশ্বিক আর্থিক অবস্থার মধ্যে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছে একটি পুঁজিতন্ত্রী সমাজ-যা ব্যাপ্তী, পরিসর ও পরিধিতে বৈশ্বিক, তা হচ্ছে পুঁজি'র প্রথম পরিণতি; পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অধিপতি শ্রেণী- পুঁজিপতি, পুঁজির শর্তেই নৈরাজ্যিকভাবে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করার মাধ্যমে অতিরিক্ত পণ্য উৎপন্ন করে বাজার সংকটে নিপতিত হয়ে মন্দাক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ নিজ নিজ মালিকানা হারিয়ে শ্রম শক্তি বিক্রেতায় পরিণত হওয়ার পর্যায়ে পুঁজি নিজেই ব্যক্তিমালিকানার প্রতিবন্ধক হয়েছে ।

ফলে-পুঁজিপতি শ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করে মরিয়া হয়েও পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষায় যুদ্ধ-বিশ্ব যুদ্ধ ইত্যকার নানান ক্ষতিকর-ভয়ানক ও জঘন্য দুস্কর্মে সচেষ্ট থাকতে গিয়ে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সহ মুদ্রা ইত্যাদির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে পুঁজিতন্ত্রের বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য নানান বৈশ্বিক সংস্থা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে কার্যত পুঁজি বিনাশী তথা পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিলুপ্তির যাবতীয় শর্ত ও ভিত্তি সৃষ্টি করে প্রতিনিয়ত পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদ ও ধ্বংস করার সমোপস্থিত হেতুবাদ তথা মন্দা-মহামন্দার তৎপরতায় লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের অজ্ঞাতেই সামাজিক মালিকানার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নেগেটিভলি ক্রিয়াশীল। তাছাড়া, পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাজিত- পরাভূত ও নির্মুল করার উপযুক্ত ও যোগ্য - শ্রমিক শ্রেণীও বৈশ্বিক পরিসরে জন্ম দিয়েছে পুঁজি অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণী। কাজেই, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা বিনাশে বৈশ্বিক ব্যবস্থার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি অপরিহার্য বিধায় তাদার্থে গঠিত হেতু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পার্টিও বৈশ্বিক। তাই, ব্যক্তিমালিকানা বিলোপে সামাজিক মালিকানা তথা দুনিয়ার সকলের মালিকানা প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণী হিসাবে গঠন ও দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী মুক্তির আন্দোলনকে সমন্বিত-সুসংহত ও সুবিস্তৃত এবং ব্যাপকতর ও বেগবান করার আবশ্যকীয় হাতিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি- কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের অগ্রদুত।

পরাজিত বা পরাভূত হলেও পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে পুন:পুন প্রচেষ্টা গ্রহণের ভিত্তিও যোগিয়েছে পুঁজি। তাই, কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে পুঁজি'র আবশ্যকীয় পরিণতি; এবং, পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার বিনাশ ও বিলুপ্তি ঘটিয়ে সাম্যতন্ত্রী সমাজ গঠনের নিরন্তর প্রক্রিয়া স্ববিরোধীভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে পুঁজিতন্ত্র। ফলে- প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক-সংরক্ষক বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠন ইত্যাদি এবং ঐ সকল বৈশ্বিক সংগঠন-সংস্থার স্থানীয় সহযোগি প্রতিষ্ঠানাদির সহিত শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির যেমন স্থানীয়ভাবে তেমন বৈশ্বিকভাবে বিরোধ-বৈরীতা প্রসুত লড়াই সংগঠিত ও সংঘটিত করে দুনিয়ার শ্রমিকদের সকল লড়াইয়ে সামাজিক মালিকানার স্বপক্ষে- ব্যক্তিমালিকানা বিলোপের দাবীকে সকল দাবীর সামনের কাতারে ঠাঁই দিয়ে স্থানীয় ও বৈশ্বিক সকল লড়াইকে একসুত্রে গ্রথিত ও সুত্রবদ্ধ করে পুঁজিতন্ত্র বিরোধী সকল লড়াইকে সমন্বিতকরণ, সংযুক্তকরণ, বিস্তৃতকরণ, ব্যাপকতরকরণ ও তীব্রতরকরণ এবং বেগবানে তথা দ্রুততর গতি সাধনে অর্থাৎ বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্র বিরোধী বৈশ্বিক লড়াইকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বটে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী।

আর সেই বিজয়ে শ্রেণীগত ঐক্য-সংহতি হাসিলে শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠন-কমিউনিস্ট পার্টি যথাযথভাবে পুন:র্গঠিত ও কার্যকর এবং শক্তিশালী হলেই দুনিয়া হতে বিদায় নিবে পুঁজিতন্ত্র। তাতে ইতিহাসের জাদুগরে ঠাঁই নিবে বিশ্ব ব্যাংক সহ পুঁজিপতিদের রক্ষক-সংরক্ষক সকল সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদি। সুতরাং, ব্যক্তিমালিকানাহীন, শ্রেণীহীন সমাজ তথা কমিউনিজম যেমন মানব জাতির ভবিতব্য তেমন পুঁজি'র শেষ বা চূড়ান্ত পরিণতি।

অত:পর, মার্কসদের আবিস্কৃত- ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ও নীরিখে-পুঁজি, পুঁজিতন্ত্র , কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিজম,ইত্যাকার বিষয়াদি 'পুঁজি'র পরিণতি' পুস্তকে স্বল্প পরিসরে ও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হল। তবে, কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিজম সম্পর্কে কেবলমাত্র কতিপয় নীতিগত বিষয় প্রাথমিকভাবে উপস্থাপন করা হল, সুসম্পন্নকরণ ও চূড়ান্তকরণের দায়-দায়িত্ব যেমন আরো বহুজনের তেমন চূড়ান্ত অর্থে কমিউনিজমের সকল নীতি-নিয়ম, পদ্ধতি ও রীতি ইত্যাদি চূড়ান্তকরণ করবে বটে কমিউনিস্ট সমাজই।

শাহ্ আলম
১৫,নভেম্বর, ২০১১। ঢাকা।

পুঁজি

পুঁজি- কি ? মার্কসের উদ্ঘাটন-শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য। বুর্জোয়াদের দাবী-মজুরদের অংশ গ্রহণ থাকছে, তাই তাদের হিস্যামতো মজুরি প্রদান করা হয়; তবে, উদ্যোক্তার উদ্যোগই সৃষ্টি করে পুঁজি। তাই, পুঁজিপতিরাই পুঁজি'র মালিক। আর-ধর্মাশ্রয়ী বুর্জোয়াসহ ধর্মীয়গুরুদের অলংঘনীয় বাণী- পৃথিবী ও আকাশ এবং সকল প্রাণীর স্রষ্টা বিশেষ সর্বশক্তিমাণ ঈশ্বর বা ঈশ্বর-ঈশ্বরীগণ নিজগুণে স্বইচ্ছায় পুঁজি তথা সম্পদ সৃষ্টি ও বন্টন করেন নিজ নিজ পছন্দমতো। তাই, ঈশ্বরভক্তরাই ধনী বা পুঁজিপতি।

পুঁজির স্রষ্টা যেই হোক না কেন, পুঁজির মালিক হতে চায় কম-বেশ সকলেই; যার পুঁজি আছে সেও চায়, যার পুঁজি নাই সেও চায়। পুঁজি প্রাপ্তির আকাংখা সকলের মধ্যে সৃষ্টিতে সফল বটে পুঁজিতন্ত্র। কারণ- মানুষের বেচেঁ থাকার জন্য খাওয়া ইত্যকার উপকরণাদি সহ আরো আরো নানান উপকরণ যেমন ষ্টোমাকের জন্য প্রয়োজন তেমন মস্তিষ্কের চাহিদা পূরণে আবশ্যক । পুঁজিতন্ত্রে-এসকল উপকরণাদি ক্রয়যোগ্য অর্থাৎ পণ্য। কাজেই, পণ্য ক্রয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা পাওয়া যায় না। অথচ, পণ্য সম্ভারে ভরপুর পুঁজিতন্ত্রী সমাজে সকলের সমপরিমাণতো নয়ই, এমন কি জীবন ধারণের ন্যুনতম উপকরণাদি সংগ্রহের ক্ষমতা বা সুযোগ নাই বহু বহুজনের।

যাদের পুঁজি নাই, বা থাকলেও যৎকিঞ্চিত, তারা-এমনকি জীবন ধারণের উপকরণ যথাযথভাবে ক্রয়েও অযোগ্য প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে। অথচ তারা শ্রম করে। অথবা, তারা সকলেই ঈশ্বর বা বহু ঈশ্বর বা ঐশ্বরিকতায় অবিশ্বাসী তা যেমন ঠিক নয় তেমন তাদের অনকেই ঈশ্বর বিশেষের পূঁজারী ও ভক্ত নয়, তাও কিন্তু যথার্থ নয়। আবার, যারা পুঁজি বা ধন-সম্পদের মালিক তারা সাধারণত শ্রম করে না, এবং তাদের মধ্যেকার বহুজন কোনো ধর্ম বা ঈশ্বর মানে না। যদিচ, বিলিয়ন বিলিয়ন তারা ও তারকামন্ডলীর ইউনিভার্স নয়, বরং কেবলমাত্র একটি তারা তথা সূর্যের কয়েকটি গ্রহের একটি গ্রহ তথা এই একটি পৃথিবীর স্রষ্টা দাবীকারী বটে ১ বিলিয়নের বেশী সংখ্যক ইশ্বর/ঈশ্বরী হলে ঈশ্বরী/ঈশ্বর পুঁজারী অসংখ্য ধর্মের অনুসারীগণ নিজদের মধ্যকার এতদসংক্রান্ত বিবাদের সুরাহা করে আজো নিশ্চিত করতে পারেনি যে, অতোগুলো দাবীদার ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতই কে সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবীটি। তবে পৃথিবীর ব্যাপ্তী ও পরিধি নিরুপনসহ জলরাশি দ্বারা বিভক্ত ও বিভাজিত জনপদের তৎকালীন বাসিন্ধাসমেত ঐ সকল বাসিন্ধাদের ঈশ্বর-ঈশ্বরীগণের নিকট অজ্ঞাত পৃথিবীকে দুনিয়ার মানুষের নিকট একক পৃথিবী হিসাবে উপস্থাপন ও প্রমাণকারী এবং কেবল পৃথিবী নয়, বরং মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কেও তথ্য-প্রমাণ হাজিরকারী বুর্জোয়ারাই, পণ্য অর্থনীতির স্বার্থে ও যথার্থভাবে ধর্মীয় পরলৌকিকতার বদলে ইহজগতের ইহলৌকিকতা অর্থাৎ স্যাকুলারিজমের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা।কাজেই, পুঁজি সৃষ্টি ও তার মালিকানা বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ধারণে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ তথা পুঁজির মালিকানা সমেত ধর্মাশ্রয়ী ও ধর্মবিমুক্ত মানুষজন ও ধন-সম্পত্তি সহ সাম্প্রতিক

বিশ্বের কতিপয় তথ্য-উপাত্ত যেমন আবশ্যক তেমন বিষয়টি সুস্পষ্টকরণে সহায়ক বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কতিপয় তথ্য-উপাত্ত নিম্নে দেওয়া হল-

বিবৃত বিবরণ নিখুঁত হওয়ার নিশ্চয়তা নাই । তবু, উৎস হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমরা সি.আই.এ'র ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক এবং কতিপয় বিষয়ে আই.এম.এফ এবং উইকিপিডিয়ার দ্বারস্ত হলাম-

২০১০ সালে - ১৩.৭ বিলিয়ন বছর বয়সী মহাবিশ্বের মধ্যে ৪.৫৫ বিলিয়ন বছর বয়সী পৃথিবীর মোট ভূখন্ডের ১১.৫% রাশিয়া, ৬.৭% কানাডা, ৬.৫% চীন, ৬.৫% যুক্তরাষ্ট্র, ৫.৭% ব্রাজিল, ২.৩% ভারত, ০.৪৩% ফ্রান্স, ০.২৫% জাপান, ০.২৪% জার্মানী, ০.১৬ যুক্তরাজ্য, ০.১০% বাংলাদেশ, ০.১০% নেপাল এবং ০.০০০০০০৩ ভ্যাটিকান সিটি, সমেত পৃথিবীর মোট ভূমি খন্ডের আয়তন-১৪৮.৯৪ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার; এবং ৭০.৯% পানি সমেত পৃথিবীর মোট আয়তন-৫১০.০৭২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। ল্যান্ড বাউন্ডারী-২৫১,০৬০ কিলোমিটার। চাষযোগ্য ভূমি-১০.৫৭%। তবে স্থায়ীভাবে ফসল ফলানো হয় না মোট ২% ভূমিতেও।

উল্লেখিত দেশগুলির জনসংখ্যা, দরিদ্র মানুষ এবং পুঁজির পরিমাণ বা হার ইত্যকার বিষয়াদি দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা দেশগুলির বর্ণিত ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অবস্থান বুঝতে যথাক্রমে নির্দেশক হিসাবে - (ক) জনসংখ্যা , (খ) জিডিপি (পারসেজিং পাওয়ার প্যারেটি) (গ) পিপিপি (পার ক্যাপিটা) , (ঘ) বিপি (বিলো প্রভার্টি লাইন) , এবং (ঙ) এস ডি আর (স্পোশাল ড্রয়িং রাইট) ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সংক্ষেপে কেবলমাত্র (ক), (খ), (গ) , (ঘ) , এবং (ঙ) ব্যবহার করব। তবে, তথ্যসূত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১নং স্থান দখলকারী হিসাবে যেমন জিপিডি ইত্যাদিতে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য- সদস্য রাষ্ট্রগলোর পুঁজির পরিমাণ দ্বারাই আই.এম.এফের এস ডি আর ঠিক করা হয়। তাই এস ডি আর দ্বারা দেশগুলোর বৈশ্বিক পুঁজির অংশীদারীত্ব বুঝা যায়।

রাশিয়া- (ক)০৯, (খ) ০৭, (গ) ৭১, (ঘ) ১৩.১%, এবং (ঙ) ২.৫০%;
কানাডা- (ক) ৩৭, (খ) ১৫, (গ) ২২, (ঘ) ৯.৪%, এবং (ঙ) ২.৬৮%;
চীন- (ক) ০১, (খ) ০৩, (গ) ১২৫, (ঘ) ২.৮%, এবং (ঙ) ৪.০০%;
যুক্তরাষ্ট্র - (ক) ০৩, (খ) ০২, (গ) ১১, (ঘ) ১৫.১%, এবং (ঙ) ১৭.৭০%;
ব্রাজিল - (ক) ০৫, (খ) ০৯, (গ) ১০২, (ঘ) ২৬%, এবং (ঙ) ১.৭৯%;
ভারত - (ক) ০২, (খ) ০৫, (গ) ১৬২, (ঘ) ২৫%, এবং (ঙ) ২.৪৫%;
ফ্রান্স - (ক) ২১, (খ) ১০, (গ) ৩৯, (ঘ) ৬.২%, এবং (ঙ) ৪.৫১%;
জাপান - (ক) ১০, (খ) ০৪, (গ) ৩৮, (ঘ) ১৫.৭%, এবং (ঙ) ৬.৫৭%;
জার্মানী - (ক) ১৬, (খ) ০৬, (গ) ৩৩, (ঘ) ১৫.৫%, এবং (ঙ) ৬.১২%;
যুক্তরাজ্য - (ক) ২২, (খ) ৮, (গ) ৩৭, (ঘ) ১৪%, এবং (ঙ) ৪.৫১%;
বাংলাদেশ - (ক) ০৭, (খ) ৪৫, (গ) ১৯৬, (ঘ) ৪০%, এবং (ঙ) ০.২২%; এবং
নেপাল - (ক) ৪১, (খ) ১০২, (গ) ২০৬, (ঘ) ২৪.৭%, এবং (ঙ) ০.০৩%।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে ২০১০ সালে- মোট জনসংখ্যা-৩১৩,২৩২,০৪৪জন, মোট জিডিপি-$ ১৪.৬৬ ট্রিলিয়ন, এবং (গ) খাতে তথা মাথা প্রতি বার্ষিক গড় আয় -$

৪৭.২০০। ৭৫ টাকা হারে বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩৫৪,০০০.০০ টাকা এবং মাসে ২৯৫,০০০.০০ টাকা মাত্র। আর বাংলাদেশ, নেপাল ও কংগোতে ২০১০ সালে মাথা প্রতি গড় আয় যথাক্রমে – বাংলাদেশী মুদ্রায় ১২৭,৫০০.০০ টাকা এবং মাসিক ১০৬,২৫.০০ টাকা; ৯০০,০০০.০০ টাকা এবং মাসিক ৭,৫০০.০০ টাকা; এবং ২২,৫০০.০০ টাকা, এবং মাসিক ১,৮৭৫.০০ টাকা। তবে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ শিল্পখাত অর্থাৎ গার্মেন্টস খাতে মাসিক ন্যুনতম মজুরি ২০১১ সালেও ৩,০০০.০০ টাকা মাত্র। বিপরীতে ইউরোপের ছোট্ট দেশ লাইছটেনটেইনের কয়জন মানুষ ধর্মাশ্রয়ী তা নির্ণয়ে জরিফ আবশ্যক; তবে লক্ষ্মী–গণেশের অনুগামী যে নাই তাতো বোধগম্য। অথচ, সেখানে ২০০৮ সালেও মাথা প্রতি গড় আয়– ১০,৫৮২,৫০০.০০ টাকা এবং মাসিক– ৮৮১,৮৭৫.০০ টাকা মাত্র। তাই বলে ওখানে কেউ দরিদ্র নাই এমনটা নয়। অথবা মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর দেশ আইসল্যান্ডে– ২০১০ সালে মাথা প্রতি গড় আয়–২,৪৯৭,৫০০.০০ টাকা, এবং মাসিক– ২০৮,১২৫.০০ টাকা মাত্র ভয়ানক মন্দায়ও। তাছাড়া,সুইডেন– আর্জেন্টিনা সহ যে সকল দেশে নারী–পুরষ নির্বিশেষ সমলিংগের মানুষের বিবাহ আইনানুগভাবে সম্পন্ন হচ্ছে সে সকল দেশের সকল মানুষই বিত্তহীন বা দরিদ্র নয়। অথবা, দুনিয়ার যে সকল দেশে সমকামিতা অপরাধ নয়, সেসকল দেশের সকল মানুষও দরিদ্র নয়। অথবা, বিষ্টিলিটি চালু আছে যে সকল রাষ্ট্রে সেখানকার সব মানুষ দরিদ্র বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত নয়।

ফ্যাক্টবুকেই বিবৃত যে, বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারগুলি ক্রমান্বয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারাচ্ছে বৈশ্বিক সংস্থাগুলির নিকট। তবু, তথাকথিত ১৯৪ টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও ৭১ টি ডিপেন্ডেস সহ পৃথিবীতে মোট প্রশাসনিক ইউনিট হচ্ছে ২৬৬।

মোট বিমান বন্দর–২০১০ সালে ৪৩,৯৮২টি; মোট রেল লাইন–২০০৮ সালে– ১,১৩৮,৬৩২ কিলোমিটার; মোট সড়ক পথ– ২০০৮ সালে– ১০২,২৬০,৩০৪ কিলোমিটার; এবং মোট জলপথ–২০০৪ সালে–৬৭১,৮৮৬ কিলোমিটার। মোট টেলিফোন ব্যবহারকারী –২০০৮ সালে–১.২৬৮ বিলিয়ন, মোবাইল ব্যবহারকারী– ২০১০ সালে–৫.৩ বিলিয়ন, এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী– ২০১০ সালে–২.১ বিলিয়ন।

বিশ্বের মোট উৎপাদন–২০১০ সালে–$ ৬২.২৭ ট্রিলিয়ন। কৃষি–৫.৭%, শিল্প–৩০.৭% এবং সার্ভিস–৬৩.৬%। মোট রপ্তানি–২০০৮ সালে –$ ১৪.৯৫ ট্রিলিয়ন। মোট ষ্টক মানি–২০১০সালে– $ ৭৪.১৩ ট্রিলিয়ন। মোট মাথা প্রতি বার্ষিক আয়–২০১০ সালে–$ ১১,২০০। তবে–২০০১ সালে, দৈনিক $ ১ ব্যয় করতে সক্ষম হয়নি ১.১ বিলিয়ন মানুষ, এবং দৈনিক $ ২ ব্যয়ে অযোগ্য ছিল ২.৭ বিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞায় – ২০০১ সালে দ্রারিদ্র সংখ্যার নীচে বসবাসকারী– ২.৭ বিলিয়ন মানুষ এবং চরম দ্রারিদ্র সংখ্যার নীচে বসবাসকারী ছিল ১.১ বিলিয়ন মানুষ।

জনসংখ্যা:–১৮২০ সালে–১ বিলিয়ন, ১৯৩০ সালে –২ বিলিয়ন, ১৯৬০ সালে– ৩ বিলিয়ন, ১৯৭৪ সালে–৪ বিলিয়ন, ১৯৮৮ সালে–৫ বিলিয়ন, ২০০০ সালে –৬ বিলিয়ন, এবং ২০১১ সালের অক্টোবরে ৭ বিলিয়ন ।

তন্মধ্যে- লেবর ফোর্স-২০১০ সালে ৩.১৯১৯ বিলিয়ন, পেশা অনুযায়ী- কৃষি-৩৬.৬%, শিল্প-২১.৫%, এবং সার্ভিস-৪১.৯%। বেকারত্বের হার-২০১০ সালে-৮.৭%। আয় : সর্ব নিম্ন -১০%:২.৬% এবং সর্বোচ্চ- ১০%:২৮%। এবং ধর্মবিমুক্ত-১৪.৭% ।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে উল্লেখিত ধর্ম বিমুক্ত ১৪.৭% জনের অধিকাংশ বা প্রায় সকলেই কম-বেশ ধনী বা পুঁজিপতি। তবে, প্রকৃতপক্ষে বর্তমান দুনিয়ায় ঈশ্বর অবিশ্বাসীর সংখ্যা আরো বেশী। কারণ-টাও, বৌদ্ধ ও জৈন ইত্যকার নানা ধর্মে কোনো ঈশ্বর নাই। তাই বলে টাও,বৌদ্ধ ও জৈন বা ঈশ্বর বিমুক্ত অপরাপর ধর্মের সকল সদস্যই বিত্তহীন নয়। আবার ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালে ধর্ম ও ঈশ্বরের ভয়ানক আধিক্য ও কর্তৃত্ব নাই তা বোধ হয় ধর্ম ও ঈশ্বরের শত্রুরা যেমন দাবী করবে না তেমন গরীব মানুষের শত্রু- ধনীরাও বলতে পারবে না। কিন্তু, বিবৃত তথ্যাদি নিশ্চিত করে যে ভারত-বাংলাদেশ ও নেপালেই আনুপাতিকভাবে বেশী সংখ্যক গরীব মানুষের বসবাস। তাছাড়া - মাথা প্রতি গড় আয়ও কম। আফ্রিকার অবস্থাও তথৈবচ।

উল্লেখিত তথ্যমতে- ২০১০ সালে মাথা প্রতি -$ ১১,২০০ আয় অর্থাৎ বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ গড়ে $ ৩০ এর বেশী দৈনিক খরচ করার মতো আয় করেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুদ্রায়- দৈনিক দুই হাজার তিনশত টাকার বেশী। একজন ব্যক্তির মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য আদৌ দৈনিক এত্তো পরিমাণ টাকার দরকার আছে কি? অথচ, দৈনিক ৭৫ টাকা খরচ করতে পারছে না সোমালিয়া সহ বহু দেশের বহু মানুষ বলেই দারিদ্রমুক্ত এক বিশ্ব গঠনের ভুয়া অংগীকারে ক্রিয়াশীল বিশ্বব্যাংকের হিসাবে মতে ২০১১ সালেই সোমালিয়ায় কয়েক লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করবে কেবলমাত্র অনাহারে।

অত:পর, ধন-সম্পদ বা পুঁজি বিষয়ে ধর্মাশ্রয়ীদের বক্তব্য ঠিক হলে ধর্ম বিশ্বাসী ও ধর্মের অনুসারী মানুষজন বিত্তহীন -গরীব বা অনাহারে মরবে কেন? আবার ১২-১৩শ বিলিয়নিয়ার সহ দুনিয়ার ধনীগোষ্ঠী- ধর্মের আচার-আচরণে প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা করলেও তাদের অনেকেই ধর্মে বিশ্বাসী নয়। তাইতো, ধর্মের বিধি-বিধানে যা যা দোষণীয় ও দন্ডনীয় সেসকল কর্মাদি প্রকাশ্যে-গোপনে একছার করে যাচ্ছে পুঁজিওয়ালারা। যেমন, বহু ধর্মে সুদ হারাম বা না জায়েজ হলেও সারা দুনিয়া এখন শাসন করছে সুদের কারবারী প্রতিষ্ঠান- ব্যাংক,ইত্যাদি এবং সর্বোপরি বিশ্বব্যাংক । অথবা উত্তরাধিকারের নিমিত্তে-নিশ্চিতিতে ও স্বার্থে পত্তনকৃত দাসত্বের বিবাহ ও পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আইনে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যেমন দোষণীয় তেমন বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ক চরম দন্ডনীয় অপরাধ। অথচ, অবাধ মেলামেশা সহ অবাধে শারিরীক মিলনের স্বাধীনতা ইত্যকার বিষয়াদি বৈশ্বিক আন্দোলনের রূপ লাভ করেছে পুঁজিওয়ালাদের বদৌলতেই। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ-১৯৪৮ মুলে তা যেমন স্বীকৃত তেমন জাতিসংঘের এল.জি.বি.টি বিষয়ক কমিশন ফ্রি-লাভ বিষয়ক বিষয়গুলো বৈশ্বিকভাবে দেখভাল করে। তদার্থে ক্রিয়াশীল বটে বহু এন.জি.ও এবং সর্বোপুরি- ফ্রি লাভ বা ফ্রি-সেক্সের আন্দোলনকারীরাতো আছেই। অত:পর, ফ্রি লাভ মুভমেন্ট বা এল.জি.টি.ভি'র সমর্থক-সক্রিয় সংগঠন ও ব্যক্তিসমেত সকলেই কি পুঁজিহীন? নিশ্চয়ই

নয়। বরং, উদ্যোক্তাসহ সংগঠক এরাতো বটেই এমনকি ফ্রি লাভ মুভমেন্টের সমর্থকদেরও অধিকাংশই যে বিত্তবান তাতে সন্দেহ করার অবকাশও নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি অংগ রাষ্ট্র সহ কানাডা-অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন, নেদারল্যান্ড ইত্যকার বেশ কিছু রাষ্ট্র এল.জি.বি.টিকে সামাজিক মর্যাদা দিতে আবশ্যকীয় আইন-বিধান কার্যকরী করেছে। পৃথিবীর এককালীন সেরা ধনী দেশ ইংলন্ডেও এজাতীয় অনেক কিছু ফ্রি। মদ-জুয়া নিষিদ্ধ বটে প্রায় ধর্মে। তবু, মদ-জুয়ার ব্যবসা নাই কয়টি দেশে বা যে কয়টি হাতে গুনা দেশ ধর্মীয় কারণে মদ-জুয়ার বিরোধী বিধি-বিধান বহাল রেখেছে সেসকল দেশের রাষ্ট্রিক-রাজনৈতিক কর্তা,বয়স্ক যুবরাজরাসহ ধনী ব্যক্তিরা ফ্রান্স-ইটালী ইত্যাদি ধনী দেশগুলোতে নিয়মিত মদ-জুয়ার আসরে হাজির হয় না, এমনতো নয়। নারীর দেহ বিক্রি বা বেশ্যাবৃত্তি ধর্মে অপরাধ হলেও কেবল নারী নয়, পুরুষ বা পশুর বেশ্যাবৃত্তিতে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ কম কি ? পুঁজিপতি ছাড়া অন্য কেউতো এসব ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগ করার সুযোগ নাই।

কাজেই, পুঁজিপতিরা কেবল ধর্ম অমান্য-অবিশ্বাসই নয়, বরং ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিলুপ্তি ঘটিয়ে রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিতাড়নে ইহলৌকিকতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা ও কার্যকরণকারী ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিপ্লবে বিজয়ী বিপ্লবীরাই আধুনিককালে এল.জি.বি.টি'র ভিত্তি নতুন করে স্থাপন করেছে। ফ্রান্সের মদ-জুয়ার খ্যাতি-যশ দুনিয়াব্যাপী। কাজেই, সর্বসম্পদের কথিত মালিক ধর্মীয় বিধানের ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণ বা তাদের রক্ষক-সংরক্ষক রাজা-বাদশাগণ পুঁজিপতিদের পুঁজির প্রতাপের নিকট কেবল পরাজিত-পরাভূত হলেন না বরং পুঁজিপতিরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন স্বর্গ-নরক এবং পুঁজির বিনিময়ে ধরত্রীতেই নিজের স্বর্গসুখ হাসিল করতে গিয়ে কেবল ঈশ্বর উৎখাত নয়, বরং শ্রমিক শ্রেণী সহ দুনিয়ার মানুষদের জীবন-যাত্রাকে মারাত্মক সংকট-সমস্যায় নিপতিত করে জাগতিক নরকের বাসিন্ধা বানাতে সফল হয়েছে। অত:পর, পুঁজি বিষয়ে ধর্মাশ্রয়ীদের কথিত বাণী বিশেষ যদি সত্যি হতো তা-হলে ধর্মদ্রোহীরা হতো পুঁজিহীন আর পুঁজিপতি হতে পারতো সকল ধর্মাশ্রয়ী। কিন্তু না-তা হয়নি।

তাছাড়া- পৃথিবীর বয়স, আয়তন, আকার, পরিধি-সীমানাই কেবল নয়, উপরন্ত পৃথিবী সহ সৌরজগতের সৃষ্টি-সীমানা বা হালে নিরূপিত কোটি কোটি ট্রিলিয়ন নক্ষত্রের উপস্থিতিসমেত ৯৩ বিলিয়ন লাইট ইয়ারস আধারের মহাবিশ্বের জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের পূর্বে কোনো সমাজ জানতে পারেনি। এমনকি,আটলান্টিকের দুই তীরও অজ্ঞাত ছিল- ১৪৯২ সাল পর্যন্ত। তাই পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও উন্নতি সাধনের পূর্বে মহা বিশ্বতো নয়ই, এমনকি পৃথিবী সম্পর্কে যা যা মত-অভিমত ইত্যাদি প্রচলিত ছিল তা ভুল বা অসত্য বলে প্রমাণ করেছে -বিজ্ঞান । বিজ্ঞানীদের মতে মহা বিশ্ব কেউ তৈরী করেনি, যেমনটা বাইবেল ইত্যাদিতে দাবী করা হয়েছে। অথবা, হিব্রু বাইবেলের বক্তব্যমতো পৃথিবী - স্থির এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরে রূপ বক্তব্যও সঠিক নয়। বরং এটি প্রমাণিত সত্য যে, পৃথিবী ঘুরে নিজ অক্ষপথে এবং ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের চতুর্দিকে বছরে একবার ঘুরে; আবার সূর্যও নিজ কক্ষপথে ঘন্টায় সাড়ে এগার হাজার মাইল বেগে চলে ১১ বছরে একবার নিজ কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে। বিজ্ঞানী ডারউইন প্রমাণ করেছেন বাইবেলে বর্ণিত পুরুষ হতে নারী তৈরী হয়নি। আবার ,

বাইবেলের হিসাব অনুযায়ী মাত্র ৫-৬ হাজার বছর পূর্বে নয়, বরং বিজ্ঞানীদের বক্তব্য মতো পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে প্রায় সাড়ে তিনশত কোটি বছর আগে। পুঁজিতন্ত্রেই বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন- পুরুষের ২৩ জোড়া ও নারীর ডিম্বানু হতে ২৩ জোড়া মোট ৪৬ জোড়া ক্রোমোজম নিয়ে মানুষের জন্ম হয়।

অত:পর, নারী কেবলমাত্র পুরুষের শুক্রানু ধারণের আধার এবং নারীর ডিম্বানু সহযোগে নয় বরং কেবলই পুরুষের শুক্রানু হতে ভ্রুণ সৃষ্ট বলে শিশুর জন্ম দিয়েও প্রসূতি কেবলমাত্র গর্ভধারিণী বৈ সন্তানের মালিক-অভিভাবক না হওয়ার হেতুবাদ সম্পর্কিত প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের মানবজন্ম বিষয়ক বক্তব্য ভুল বৈ সত্য বলে ধোপে টিকার সুযোগ নাই। অথবা, ধরিত্রীর পানি হতে সৃষ্ট মেঘ বাতাসে ভেসে বেড়ায় বলেই বৃষ্টির আধার-উৎপত্তির স্থল- আকাশ; প্রাক পুঁজিতন্ত্রী যুগের এমন বক্তব্যও সঠিক নয়। অথবা, দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর এবং আত্মাই মানুষের ভাব-চিন্তা ইত্যকার বিষয়াদির আধার বা ভান্ডার এবং নিয়ন্ত্রক এমন মতামতের বদৌলতে কৃষ্ণ- গান্ধীরা মহাত্মা-লর্ড হিসাবে প্রভাব-খ্যাতি কামাই করতে সফল হলেও বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে- মানুষের চিন্তা করার একমাত্র অংগ মস্তিষ্ক। কাজেই, প্রাক পুঁজিতন্ত্রী যুগের হৃদয় বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্যাদি তথা আত্মার অবিনশ্বরতার বক্তব্য ভুয়া বা অসত্য বলে নিশ্চিত করেছে বটে পুঁজিতন্ত্রী যুগের বিজ্ঞান। বাস্প-বিদ্যুৎ, বাস্পীয় ইঞ্জিন, রেল, মোটর, বিমান, ফোন, ফ্যাক্স, রেডিও, টিভি, স্যাটেলাইট, নেট-মোবাইল ইত্যকার কোনো শক্তি,যান্ত্রিক বাহন ও বাহনাদি প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারেনি- প্রাকপুঁজিতন্ত্রী যুগ।

অথবা, ভারতীয় প্রাচীন ধারণায় " কৃপীঠ" (কাষ্ঠ) "যোনি" (জন্মস্থান) যার অর্থাৎ "কৃপীঠযোনি" বলছে অগ্নির জন্মকথা। এবং অক্সিজেন যে দহন ক্রিয়ায় সহগ তা জানতো না মানুষ ১৭৭৭ সালের আগে । অথবা, "এইছ টু ও " সমান পানি তাও অক্সিজেন-হাইড্রোজেন আবিস্কারের পূর্বে জানার সুযোগ পায়নি মানুষ। হাইড্রোজেনও আবিস্কৃত হয়েছে মাত্র -১৭৮৩ সালে। অর্থাৎ মানবদেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ- অক্সিজেন হওয়া সত্ত্বেও, এবং জীবন ধারণে আবশ্যকীয় উপাদান অক্সিজেন সম্পর্কে যেমন মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে আসার পূর্বে জানে না, তেমন আগুন, পানি ইত্যকার দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও আবশ্যকীয় উপকরণ সম্পর্কে মানবজাতি ছিল অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। অথবা, গাছের ফল - আগেও পড়েছে এখনো পড়ছে ও ভবিষ্যতেও পড়বে বা বস্তু বিশেষ উর্দ্ধমুখে নিক্ষিপ্ত হলেও তাও ফিরে আসে নীচের দিকে এটা মধ্যাকর্ষণ, অথচ, নিউটনের আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দির পূর্বে তা জানতো না কেউ। অথবা, গ্রীণ হাউজ এফেক্ট আবিস্কৃত হয়নি ১৮২৪ সালের আগে। কাজেই, প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজ পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট বিজ্ঞান সম্পর্কে যেমন ছিল অজ্ঞ তেমন বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির স্রষ্টা পুঁজির সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার সুযোগ নাই। তাই, প্রাক পুঁজিতন্ত্রী তথা সামন্ত ও দাস প্রভুদের পরজীবীতার স্বার্থ সংরক্ষায় প্রভুগোত্রীয়দের পত্তনকৃত রাজনীতি তথা ধর্ম যে,পুঁজির উৎস বা হেতুবাদ সম্পর্কে যথার্থ উত্তরদানে ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় সীমিত তাওতো প্রমাণিত। কাজেই ধর্মাশ্রয়ীদের পুঁজি বিষয়ক মতামত ধর্তব্যের বিষয় নয়।

যদিচ, শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে জাগতিক ভোগ-বিলাসে মত্ত পুঁজিপতি শ্রেণীর ধর্মাশ্রয়ী সহযোগী পরজীবী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা অমন ধোঁকার ধুম্রজালের বিস্তার সাধনে যখন-তখন বলে থাকেন যে, অমুক-তমুক কিতাব তথা বিশেষ বিশেষ পুস্তকে না কি লিখা আছে আজকের সকল বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন-উন্নতির মহামন্ত্র সহ যাবতীয় বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও প্রযুক্তির সূত্র ইত্যাদিও; তাও নাকি সবই এবং সুস্পষ্টভাবে । তাহলেও, প্রশ্ন উঠতে পারে- বিশেষ বিশেষ ঐ সকল পুস্তকাদি যারা নিয়মিত পড়েন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, ও ঐ সকল পুস্তকাদিতে মহাপন্ডিত বলে দাবীদার তারাইতো তাদের দাবীমতো তাবৎ বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির সূত্র-তত্ত্ব ও তথ্য জানানো সহ তাবৎ বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের আবিস্কারক হতে পারার যোগ্য ও উপযুক্ত এবং তাদের অনুরূপ শর্তে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তেমন যোগ্যতার পরিচয় অর্থাৎ কোনো বৈজ্ঞানিক আবিস্কার কি দাবীকৃতরা করতে সক্ষম হয়েছেন বা এ পর্যন্ত কেউ অনুরূপ যোগ্যতা ও সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারলেন না কেন?

অথবা, অক্সিজনে, হাইড্রোজেন, রক্ত কনিকা, বিদ্যুৎ-বাস্প, রেল ইঞ্জিন-বিমান, রেডিও-টিভি, ফোন-মোবাইল বা নেট ইত্যকার বিষয়াদির আবিস্কর্তা যারা তারা অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা কেউ কি বিজ্ঞান-অংক ইত্যাদি বই-পুস্তক ব্যতীত ধর্মাশ্রয়ীদের কথিত বিশেষ বিশেষ পুস্তক পাঠ করেছেন তাও কি প্রমাণিত? অথবা, সর্ব বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও উপকরণাদির একমাত্র উৎস হিসাবে দাবীকৃত ঐ সকল কথিত বই-পুস্তক স্বচক্ষে দেখেছেন বা সে সম্পর্কে জেনেছেন বা ঐ সকল বই-পুস্তক হতে সূত্রাদি সংগ্রহ করে ঐ সকল সূত্রমতো আবিস্কার কর্ম সাধন করেছেন - বৈজ্ঞানিক আবিস্কারকদের মধ্যে এমন কয়জনকে খুঁজে পাওয়া যাবে ? মুখস্ত, অসত্য, ভূয়া, বানোয়াটি ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য বিবরণ ইত্যাদি দ্বারা মিথ বা কল্পকথা তৈরী করা যায় বটে; কিন্তু তদ্বারা, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক ধারণা বা তদার্থে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া বিজ্ঞানের তথ্য-তত্ত্ব, সূত্র ইত্যাদি যেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় না, তেমন চাপ-তাপের পরিবর্তনে গঠনমূলে দ্বান্দ্বিকতার হেতুবাদে গতিসম্পন্ন পদার্থের রূপান্তর ঘটানো বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সূত্র মানুষ জানুক বা না জানুক তাতে কিছু আসে যায় না, আগে যেমন বর্তমানেও তেমন একই নিয়মে বস্তুর রূপান্তর ঘটে এবং ঘটবে ভবিষ্যতেও।

কাজেই, বৈজ্ঞানিক উপকরণ সহ ধন-সম্পদের সৃষ্টি, মালিকানা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ইত্যকার বিষয়ে প্রাক পুঁজিতন্ত্রী যুগের মতামত-অভিমত কার্যতই অজ্ঞতা, অন্ধত্ব ও স্বার্থান্ধতা প্রসূত। অত:পর, ইতিহাসের তথ্য-প্রমাণ এবং যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত যুক্তিতর্কে এটিও নিশ্চিত যে, পুঁজি বিষয়ে ধর্মাশ্রয়ীদের মতামত সঠিক নয়। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই পুঁজি ও পুঁজির মালিকানা বিষয়ে ধর্মাশ্রয়ীদের মতামত বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত নয়।

প্রাপ্ত তথ্য মতে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ এবং মানুষের নিকট মানুষের পরাধীনতা সমবয়সী। অর্থাৎ দুই লাখ বছর বয়সী মানবজাতি প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার বছর পর্যন্ত যেমন শোষণ করা কাকে বলে তা- জানতো না তেমন মানব জাতির কেউ কারো জন্য উদ্বৃত্ত শ্রম দিত না বলে কেউ কারো নিকট পরাধীন ছিল না। অথবা দাস-প্রভু ছিল অজ্ঞাত। সকলের সম্মিলিত শ্রমে আয়ত্তকৃত বা সংগৃহীত বা উৎপন্ন সামগ্রী সকলেই ভোগ-ব্যবহার করতো। সংগত কারণেই,সেই সময়ে ব্যক্তিমালিকানা বা ব্যক্তিমালিকানার

বোধও ছিল অনুপস্থিত। কাজেই, তখন বিবাহ বা বিবাহ হতে উদ্ভুত পরিবার ছিল না। তাই, পারিবারিক দাসত্ব ও অনাচারাদি ছিল অজ্ঞাত। লৈগিংক ভেদাভেদ ছিল অচিন্ত নীয়। কর্মক্ষম সকলের সম্মিলিত প্রয়াশ-শ্রমে সকলেই জীবন-যাপন করতো।

যখন হতে মানুষ মানুষকে পরাধীন অর্থাৎ দাস করেছে তথা কতিপয় ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তিকে স্বীয় জীবিকা করেছে তখন হতেই পরশ্রমজীবী তথা পরজীবীদের জীবিকা সংগ্রহ ও উৎপন্নকারী ব্যক্তিগণ উদ্বৃত্ত শ্রম দিয়ে আসছে। সেই সময়ে জীবন ধারণের উপকরণগুলি যারা সংগ্রহ বা উৎপন্ন করতো তারা ছিল দাস তথা পরশ্রমভোগী প্রভুদের অধীন । অর্থাৎ দাসেরাই ছিল প্রভুদের জীবিকা উৎপন্নের শক্তি বা উৎপাদনের উপায়। তাই দাসদের সংগৃহীত ও উৎপন্ন সামগ্রী ও উপকরণগুলির মালিকানা লাভ করতো না দাসেরা।অত:পর, দাস প্রভুরা ছিল সেই সকল উপকরণের মালিক।অথচ, প্রভুরা কোনো ধরণের উপকরণ/সামগ্রী সংগ্রহ বা উৎপন্ন করতো না।তবু দাস মালিকানার সুযোগ-সুবিধায় খোদ দাসদের শ্রমে উৎপন্ন বা সংগৃহীত উপকরণাদির মালিকানার সুযোগ-সুবিধাভোগী প্রভুরা স্বয়ং স্বীয় কর্তৃত্বে দাসদের কোনো মতে বেঁচে থাকার জন্য অন্যূন প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রদান করে অবশিষ্ট সকল সামগ্রী/উপকরণ নিজেরাই ভোগ-ব্যবহার করতো। সুতরাং, উৎপাদনের উপায় বা শক্তি -দাসদের সংগৃহীত ও উৎপন্ন সামগ্রী'র মধ্যে হতে দাস মালিকরা যা ভোগ-ব্যবহার করতো তা ছিল দাসদের কর্তৃক সৃষ্ট উদ্বৃত্ত। অর্থাৎ দাসগণ যা ভোগ ব্যবহার করতো তা উৎপন্ন ও সংগ্রহ করার জন্য যে পরিমাণ শ্রম সময় প্রয়োজন, সেই সময়ে দাসগণ নিজেদের জন্য ব্যয় করতো। ধরা যাক গড়ে দৈনিক ৪ শ্রম ঘন্টা। অত:পর, ২৪ ঘন্টার অবশিষ্ট ২০ ঘন্টার মধ্যকার পানাহার ও বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময়ের শ্রমে উৎপন্ন বা সংগ্রহকৃত সমাগ্রী ভোগ-ব্যবহার করতো প্রভু গোত্রীয়রা। অর্থাৎ দাসযুগে দাসদের উদ্বৃত্ত সময়ের শ্রমফল ভোগ-ব্যবহার তথা আত্মসাৎকারী হচ্ছে দাস মালিক ব্যক্তি তথা প্রভু বা প্রভুগোত্রীয়রা । তাই দাস-প্রভু সম্পর্কের সমাজ ইতিহাসে - দাস সমাজ হিসাবে চিহ্নিত।

দাস সমাজের যুগেই ভূমি- উৎপাদনের উপায়ে পরিণত হওয়ায় ভূমি ভিত্তিক সামাজিক অবস্থায় আবশ্যকতা দেখা দেয়। অর্থাৎ পুরোনো সামাজিক সম্পর্কের সহিত নতুন উৎপাদনী উপায়ের বিরোধে ফলে পত্তন হয়- ভূমি দাসত্বের সামন্ত সমাজ। ইতিহাসে রোমান সাম্রাজ্য হচ্ছে সর্ববৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

ভূমি-দাসত্বের যুগেও ভূমিপতি সামন্তরা সহযোগি সমেত মধ্যযুগীয় বর্বরতার ভোগ-বিলাসী জীবন যাপন করতো প্রায় সাংবার্ষরিক অভুক্ত অবস্থায় থাকা বা বছর বছর দুর্ভিক্ষ-মহামারিতে আক্রান্ত ও নিহত ভূমি-দাসদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শ্রমজাত সামগ্রী দ্বারা। ভূমি দাসত্বের শৃংখল ও বন্দীত্বে আটক ভূমিদাসেরা চুক্তিকৃত ভূমিখাজনা প্রদান করুক বা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির বিনিময়ে সামন্ত অধিপতির জন্যবেগারীতে সামন্তপ্রভুর ভূমি কর্ষণ করা সহ নানান ধরণের বেগারীর মাধ্যমে ভূমি প্রভুর জন্য উদ্বৃত্ত জোগাত। তাই, ভূমি দাসত্বেও ভূমি দাসেরা নিজেদের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ঘন্টা ব্যয় করতো য'দ্বারা তারা নিজ নিজ পরিবার-পরিজন সহ জীবনপাত করতো। অত:পর, ভূমিদাসেরা নিজেদের জন্য ব্যয়িত শ্রম দিবস বা শ্রম ঘন্টা ব্যতীত অবশিষ্ট শ্রম দিবস বা শ্রম ঘন্টা খাটতো হতো ভূমি মালিক তথা সামন্ত প্রভুদের জন্য। খাজনা, কর, বেগারী

ইত্যাদি যে নামেই আদায় করা হোক না কেন কার্যত- তা ছিল ভূমিদাসদের উদ্বৃত্ত শ্রমজাত ফল। অথচ, সেই ভূমি দাসত্বের যুগেও সামন্তপতিরা দাবী করতো তারাই ঈশ্বরের উত্তরাধিকার এবং ঈশ্বরই জন্ম দিয়েছে দাসদের কেবলই ঈশ্বর-ঈশ্বরীগণকে মান্য-ভক্তি করতে। তাই, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সামন্তপতিরাই দাসদের জন্ম-মৃত্যু বা বাঁচা-মরার বিষয়াদি দেখভাল করে থাকেন হেতু ভূমি দাসেরা তাদের উদ্বৃত্ত শ্রম সমান্ত প্রভুকে প্রদানে জন্ম শর্তেই বাধ্য।

আবার, সামন্ত সমাজের গর্ভে জন্ম নেওয়া আধুনিক উৎপাদনী উপায়ের বিরোধ-বৈরীতায় বিনাশ হল সামন্ততন্ত্রের; প্রতিষ্ঠিত হল পুঁজিতন্ত্র। পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পুঁজিপতিরাই স্বীয় সমর্থক-রক্ষক ও সহযোগি সমেত মজুরি দাস- শ্রমিকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করছে। কাজেই, উদ্বৃত্ত-শ্রমে উৎপন্ন সামগ্রী বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের ইতিহাস হচ্ছে পরজীবীতা-পরাধীনতা,শোষণ-শাসন, বৈষম্য-বৈরীতা, ভেদাভেদ-বিবাদ, দমন-পীড়ন, অত্যাচার-অনাচার, বঞ্চনা-প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার-প্রতারণা, নকলবাজি-জালিয়াতি, চালাকি-চালবাজি, শঠতা-জোচ্চুরি, প্রভুত্ব-দাসত্ব , এবং শ্রেণী বিভাজন, শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী সংঘাতের ইতিহাস। যদিচ, কালে কালে দাসত্বের ধরণ বদল হয়েছে মাত্র । সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্য শর্তাধীন দাসত্ব যতোদিন থাকবে তথা যতোদিন উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হবে ততোদিন মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার সুযোগ নাই।

তাইতো, পুঁজিতন্ত্রের কৌশলী সাফাইদার- এমনকি লেনিন-হোচিমিন প্রমুখরা যতোই বলুক ইংলন্ড হতে আমেরিকার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সনদ তথা " All men are created equal" রূপ বক্তব্য সম্বলিত আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র চির অমর বা আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ হচ্ছে মহান মুক্তির যুদ্ধ; তাতে কিন্তু,বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন আমেরিকার মানুষ স্বাধীন ও মুক্ত হয়নি। কার্যত, আমেরিকায় এখনো যেমন বিপুল সংখ্যাধিক্য মানুষ মজুরি দাস,তেমন লেনিনদের দাবীকৃত ঐ মহান স্বাধীনতা লাভের আমেরিকায় ১৭৯০ সালে ক্রীতদাসদের সংখ্যা-৬,৯৭,০০০ থাকলেও হোচিমিনদের ভিয়েতনামী স্বাধীনতার ঘোষণা মুলে স্বীকৃত- অস্বীকার অযোগ্য সত্যের আমেরিকার অমর সনদের প্রণেতা ও কার্যকরতাকারী জেফারসন্স-ওয়াশিংটনদের নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে পরিচালিত আমেরিকায় ১৮৬১ সালে ক্রীতদাসদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল-প্রায় ৪০ লাখে। কাজেই, রাষ্ট্র হিসাবে আমেরিকা স্বাধীন হলেও স্বাধীন আমেরিকার দাসেরা যেমন স্বাধীন বা মুক্ত হয়নি তেমন এখনো দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক বিলিয়নিয়ারের বসতি আমেরিকায়- ৮০% জন প্রায় সম্পত্তিহীন বলেই ঐ ভুয়া সনদমূলে আমেরিকার মানুষ যে সমান হয়নি তাতো বিবৃত তথ্যই নিশ্চিত করে। উপরন্ত ধন বৈষম্য সমেত নানান ধরণের বৈষম্য-বৈরীতা, ভেদাভেদ -বিবাদ, খুনাখুনি-সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতি, ঘুষ-দুর্নীতি ও দন্ডাদি আমেরিকায় বাড়া ছাড়া কমেনি।

যেহেতু মানুষই মানুষকে পরাধীন করেছে, সেহেতু পরাধীন মানুষ মুক্ত-স্বাধীন হতে চাইবে না বা তজ্জন্য নানা মুখি কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হবে না তাতো হতে পারে না। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বাধীন দাস বিদ্রোহ সহ নানা দেশের নানান বিদ্রোহ-যুদ্ধ ইত্যাদির ইতিহাস তা প্রমাণ ও নিশ্চিত করে। যদিচ, মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিদাতারা নিজেরাই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা তথা পরজীবীতার সুযোগ অব্যাহত রাখার

চেষ্টা-অপচেষ্টা করে তাদের প্রতি আস্থাশীল -বিশ্বাসীদের আস্থা-বিশ্বাস ভংগ-হানি করে নিজেরাই অপরের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হয়েছে বলেই দাস-সামন্ত সমাজের মতোই পুঁজিতন্ত্রী সমাজও যথারীতি শ্রেণী বিভাজিত ও শ্রেণী শাসিত ।

আবার প্রভুত্বকারী পরজীবীরা যদি নিজেরা নিজেদেরকে দাসদের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতাবান-বুদ্ধিমান বা মেধাবী বা বিশিষ্টজন বা মানুষের উর্ধে অবস্থিত কোনো বিশেষ মহান প্রাণী হিসাবে প্রতিপন্ন করতে না পারে তবেতো, তাদের পরজীবীতার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বিপন্ন ও ধ্বংস হবে। তাইতো উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাতের সূচনাকাল হতেই উদ্বৃত্ত-শ্রম বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের সুযোগ-সুবিধা জায়েজ ও বহাল রাখার নিমিত্তে অর্থাৎ যা প্রকৃতই অন্যায়, অন্যায্য, অসত্য, অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক, এমন সব বিষয়াদিকে কৃত্রিমভাবে ন্যায়-ন্যায্য, যৌক্তিক, স্বাভাবিক, ও চিরন্তন সত্য হিসাবে উপস্থাপন করে উদ্বৃত্ত-শ্রমে উৎপন্ন সামগ্রী আত্মসাৎকারীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পত্তন করা সহ তদানুরূপ কর্তৃত্বের স্বপক্ষে যেমন জগত ও জীব সৃষ্টি এবং জাগতিক-সামাজিক ক্রিয়াদি ও সম্পর্ক অর্থাৎ সম্পদ-ধন উৎপন্ন হওয়া ও তা ভোগ-ব্যবহারের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নানান মতাদর্শ বানোয়াটিমুলে উৎপন্ন করতে থাকে তেমন ঐ সকল ভুয়া মতাদর্শ মুলে ঘোষিত ও প্রণীত নানান ধরণের আইন-সংহিতা, বিধি-বিধান কার্যকরণে জন্ম দিতে থাকে নানান ধরণের সংস্থা ও সংগঠন। প্রকৃতার্থে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও তা কার্যকরণে হত্যাসহ নির্মম-নিষ্ঠুর দন্ডাদির মাধ্যমে দাসদেরকে সর্বসময়ে দাস বানিয়ে রেখে পরজীবীতার সুযোগ বহাল রাখাই ছিল এসব মতাদর্শ ও মতাদর্শ ভিত্তিক বিধি-বিধান সৃজন ও বাস্তাবয়নে পত্তনকৃত সংস্থা-সংগঠনের লক্ষ্য ও কার্যকারণ। আর, এসকল মতাদর্শের নাম দেওয়া হয়েছে-ধর্ম।

দীর্ঘদিনের আদি সাম্যতন্ত্রী সমাজের বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্ব-শ্রমজীবী মানুষকে কতিপয় চালাক-চতুর মানুষের জীবিকা তথা দাস বানিয়ে শ্রেণী বিভক্ত দাস সমাজের পত্তন করে মিশরীয় প্রভুগোত্রীয় ফারাও ডাইনেষ্টীই দুনিয়ায় প্রথম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহ তদার্থে ঐ রূপ মতাদর্শ তথা ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক বিধি-বিধানের জন্ম দিয়ে পরজীবীতার সুযোগ কার্যকরীকরণ ও স্থায়ীকরণের হীতাদি করেছে। অর্থাৎ ধর্মাশ্রিতদের দাবীমতো স্বয়ং সৃষ্ট ঈশ্বর প্রকৃতই স্ব-সৃষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার প্রথম কল্পিত ঈশ্বরকে বানোয়াটিমুলে জন্ম দিয়েছে তথা ঈশ্বর সৃষ্টি করছে বটে খোদ মিশরীয় দাস প্রভুরা তথা ফারাও ডাইনেস্টী। কালে কালে গড জুপিটার, গড জিউস, গড শিন্টু, গড ব্রক্ষা সহ এরকম শত-সহস্র নয় এক্কেবারে কোটি কোটি গড-গডেসের জন্মদাতা বটে নানান দেশীয় রাজকীয় কর্তৃত্বই। তাইতো এসকল গড-গডেসদের সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় বলেই ঐ সকল বিষয়াদিকে বলা হয় মাইথোলজি তথা কল্পকথা।

অত:পর, মানুষ সৃষ্ট ঈশ্বরের নির্দেশিকা কার্যত রাজকীয় স্বার্থ নিশ্চিতকরণে রাজকীয় কর্তৃত্বে ঘোষিত-প্রণীত রাজাধীনস্ত সকলের দৈনন্দিন কার্য-বিধি ও আচার-আচরণের নিয়মাবলী-ই কথিত ঐশ্বরিক বিধান তথা ধর্ম। তাইতো মিশরীয় ঈশ্বর- তার লিখিত ধর্মগ্রন্থ দিতে পারেনি। কারণ মিশরীয় ফারাও ডাইনেস্টী তখনো পড়া-লেখার বিহীতাদি করতে পারেনি। কিন্তু, যখনই অক্ষর আবিস্কৃত হল, লেখা-পড়ার প্রচলন হল,

মিশরীয়রাই কাগজ হিসাবে প্যাপিরাস ব্যবহার করলো; কেবলমাত্র তার পরেই ফারাওরা তাদের ধর্মগ্রন্থ- " বুক অব পিরামিড" তথা "কবরের গ্রন্থ" লিখা হলো । সুতরাং ঈশ্বর এবং ধর্ম- এদু'ই কার্যত উদ্বৃত্ত-শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-সামগ্রী বা উদ্বৃত্ত-মুল্যের সমবয়সী।তাইতো , ঈশ্বরের স্রষ্টা রাজা বা রাজকীয় কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরও কার্যত সমবয়সী। অত:পর, দাস বা দাসত্ব আর রাজা বা রাজনৈতিক কর্তৃত্বও সমবয়সী। সুতরাং, দাসত্বের বিধান ধর্ম এবং দাসও সমবয়সী।
অথচ, ১লাখ ৯৫ হাজার বছর পর্যন্ত মানবজাতি ছিল যেমন ঈশ্বর ও ধর্ম মুক্ত তেমন রাজা-বাদশা ও রাজকীয় সহযোগি উজির-নাজির, সেনা-কোতয়াল, কাজি-ধর্মবেত্তা ও গুরু তথা পরজীবী ও পরজীবীতা মুক্ত। অত:পর, পরজীবীতার সূচনা তথা উদ্বৃত্ত-শ্রমে উৎপন্ন সামগ্রী বা উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন হওয়া থেকে এ যাবৎ যা কিছু ন্যায়, ন্যায্য, সত্য ও সুনীতি হিসাবে চালু ও জারী আছে তা- প্রকৃতার্থেই অন্যায়, অন্যায্য, অসত্য ও দুর্নীতি। কাজেই, কৃত্রিম সত্য, কৃত্রিম ন্যায়, কৃত্রিম ন্যায্যতা, কৃত্রিম নীতি ও কৃত্রিম নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত, চালিত ও তাড়িত হচ্ছে এখনো মানুষ কেবলই উদ্বৃত্ত-শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-সামগ্রী বা উদ্বৃত্ত-মুল্যের হেতুবাদে।তাইতো,শ্রেণী বিভক্ত সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী সকল ন্যায়-নীতি,নৈতিকতা ও মতাদর্শ কেবলই বানোয়াটি,কৃত্রিম,অসত্য, অনৈতিক, অন্যায়, অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক।তাই এসবই প্রকৃতার্থে মানুষ, মানবিকতা ও মানবিক মর্যাদার জন্য অবমাননাকর-ক্ষতিকর।

প্রকৃতিজাত মানুষ প্রকৃতি বিজয়ে নিরন্তর চেষ্টা করে নিজেদের বিজয়কে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, দাস মালিক ও সামন্ত প্রভুরা দাসদের পরাজিত-অধীনস্ত করে প্রকৃতিকে বিজয় নয়, কেবলই দাস-ভূমিদাসদের শ্রমে বিলাসী জীবন যাপনের সুবিধায় নিজেদেরকে যেমন ঈশ্বর-ঈশ্বরীগণের পক্ষে দাস-ভূমিদাসের জীবন ও জীবিকার রক্ষক-সেবক সাজিয়ে প্রভু বনেছে, তেমন প্রকৃতির নানান উপাদান এবং প্রকৃতি জাত চন্দ্র-সূর্য, পৃথিবী ইত্যকার গ্রহ-নক্ষত্র এবং বৃক্ষ-পশু ইত্যাদিকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের সহযোগি দেবতা ইত্যাদি সাজিয়ে জীবন ও ধন-সম্পদের রক্ষক-সেবক সাব্যস্তে ও তদার্থে প্ররোচনা-প্রলুব্ধ ও ভীয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে বাধ্য করলো এই সব কথিত নানান দেবতার পূঁজা-উপসনা করতে। ফলে, প্রকৃতিরও দাসে পরিণত হল মানুষ। তাইতো, প্রকৃতি জয়ে ও প্রকৃতিকে জানতে চাওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতি ও জীব এবং জীবের ক্রিয়াদি সম্পর্কে কেবলই অজ্ঞতা-মুর্খতার অন্ধকার গর্তে নিপতিত রইল পুরো মধ্যযুগ। অত:পর, মহা বিশ্বতো নয়ই, এমনকি পৃথিবীর আকার-আয়তন ও গঠন ইতিহাসও নয়, কেবলমাত্র পৃথিবী যে স্থির নয়, তাও কোপার্নিকাসের পুর্বে জানতে পারেনি কেউ। পুঁজিতন্ত্র- পুঁজির তাড়নায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে যাত্রা শুরু করলেও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে কেবলই মুনাফার স্বার্থে তাইতো পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিজ্ঞান মনস্ক না হয়ে বরং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাকে পুঁজির শিকলে বন্দী করে মরণদশায় উপনীত হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীও টিকে থাকার জন্য আশ্রয় নিচ্ছে ধর্মীয় মতাদর্শের শিবিরে। সেজন্যই কেবল ব্যক্তি নয়, বহু রাষ্ট্রের "ধর্ম" হচ্ছে বটে নানান ধর্ম বিশেষ।

ধর্মের আবরণে কার্যত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিয়ে শুরু -পরজীবীতার সংরক্ষায় উদ্বৃত্ত-শ্রমে উৎপন্ন সামগ্রী ভোগীরা কেবলমাত্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্ত ঈশ্বর ও ঈশ্বরের উত্তরাধিকার রাজকীয় কর্তৃপক্ষকে রক্ষা ও কার্যকর রাখতে সম্রাট হাম্মুরাবীই প্রথম লিখিত আইন চালু করে, তদ্বারা রাজদ্রোহী ও দাসদের দন্ডবিধান সমেত অপরাপর পরজীবী তথা প্রভুদের পরাজিত ও পরাভূত করে নিজ নিজ ডাইনেষ্টীর অধীন ও দাস সংখ্যা বর্ধিত করার জন্য সকল রাজন্যবর্গই জন্ম দিয়েছে সেনাসহ নানান বাহিনী। ফলে- প্রকৃতি হতে উদ্ভুত হলেও প্রকৃতি জয়ে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত মানুষ দাসত্বের জন্ম লগ্ন হতেই নিজেরা পরস্পরের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত হল। কাজেই, যুদ্ধ,খুন, জখম, সন্ত্রাস, লুন্ঠন, দখল, জবরদখল,বেদখল, হিংসা, বিদ্বেষ, হামলা, আক্রমণ, ইত্যকার জঘন্য ক্রিয়াদি যেমন পরজীবীতার সহজাত ও উপজাত তেমন পরজীবীতার সম বয়সী। হত্যা-লুন্ঠন, অগ্নি সংযোগ-ধর্ষণ, ভাংচুর-ধ্বংসযজ্ঞ, ভয়-সন্ত্রাস ও অশান্তির রাজনৈতিক মুর্তরূপ যুদ্ধের জীবন্ত উপকরণ দাসেরা যাতে আমৃত্যু প্রভুর স্বার্থে জীবনপাত করে সে জন্য দাসদেরকে মানসিকভাবে বংশপরম্পরায় মানুষ নয়, বরং প্রভু ভক্ত কুকুর তূল্য দাসানুদাস বানিয়ে রাখার বদমতলবে ও তদার্থে দুরভিসন্ধিমূলে সৃষ্ট মতাদর্শ ইত্যাদির সৃজন-নবীকরণ ও মহিমা কীর্তন ইত্যাদি'র জন্যও গুরু, ইত্যকার বুদ্ধিজীবী নামক পরজীবীতার উচ্ছিষ্টভোগী একটি বিশেষ গোত্রেরও জন্ম দিয়েছে শোষকরা।

বুদ্ধিজীবীরাই পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত ও অক্ষুন্ন রাখতে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন সম্পর্কে খোদ দাসেরা যাতে জানতে-বুঝতে না পারে, বিপরীতে দাসেরা বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য উদ্বৃত্ত-মুল্যভোগীদের দয়া-দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করে একদিকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের অংশীদার রাজকীয় কর্তৃত্বকে আমৃত্যু জীবন ও জীবিকার রক্ষক স্বীকৃতিতে ও মান্যে নিজেকে কেবলই ভিক্ষুক-দাসানুদাস প্রতিপন্ন করে সেরকম মতাদর্শ -জীবনদর্শন তথা জীবন ও জগৎ সৃষ্টি এবং জাগতিক-সামাজিক ক্রিয়াদি সম্পর্কে ভুয়া-অসত্য ও বানোয়াটি মতাদর্শ সৃজন করে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপ রাজকীয় কর্তৃত্বকে ভুয়া ও অসত্যভাবে সম্পদের স্রষ্টা -দাতা ও রক্ষক সাব্যস্ত করেছে; এমনকি পুঁজিতন্ত্রী যুগেও যখন কথিত ঈশ্বরের হুকুম-নির্দেশ বা দয়া-দাক্ষিণ্যে বা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার আনুকুল্যে ধন-সম্পদ উৎপাদন-সংগ্রহ নয় বরং বিরূপ ও বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশীভূত করে ও প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমুখিন ব্যবহার করে ঈশ্বর নয়,মানুষের সৃষ্ট-প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিল্প-কারাখানায় দিবা-রাত্রির ব্যবধান ও দুরত্ব ঘুছিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদে শ্রম প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার ও বিনিময় উপযোগি পণ্যে পরিণত করে যে শ্রমিক শ্রেণী সেই শ্রমিক শ্রেণীকেও মুল্য ও উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে শ্রমের ভুমিকা সম্পর্কে বুঝতে-জানতে না দিতে বা সামাজিক শ্রমে সৃষ্ট মুল্যের অংশীদারীত্ব বিষয়ে অসচেতন ও অন্ধকারে রাখতে পণ্যের উপকরণ বা মুল্যের উপকরণ ও অংশীদার সম্পর্কে ঈশ্বরের নামে না হলেও অর্থশাস্ত্রের আবরণে পুঁজিতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা অসত্য-বানোয়াটি গাল-গল্প তৈরী করেছে । তাই, তারা পণ্য উৎপাদনে- পুঁজি, ভূমি, উদ্যোগ ও মজুরকে আবশ্যকীয় গণ্য করে সেমতে সুদ, খাজনা, মুনাফা ও মজুরি নীতি কার্যকর করছে। কিন্তু, আপাত দৃষ্টিতে ও বাহ্যত বিষয়টি ঠিক বলে

মনে হলেও কার্যত ভূমি ব্যবহারে খাজনা দিতে হলেও প্রকৃতই ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভূমির খাজনা যে দিতো হতো না তা কি মিথ্যা? ভূমিতো কেউ সৃষ্টি বা উৎপন্ন করেনি। সুর্যের আলো, পানি ইত্যাদির মতো ভূমিও প্রাকৃতিক সম্পদ । উপরন্ত ভূমি আগে ছিল, ব্যবহৃত হয়েছে এবং ভূমি আছে।পুঁজি এখন আছে বটে কিন্তু আগেতো ছিল না। অত:পর, পুঁজি এলো কোত্থেকে সে বিষয়ে এডাম স্মিথ গবেষণা থামিয়েছেন, একালেও পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতিজীবীরা নীরব থাকছেন। জানেন না বলা যাবে না তবে স্বীয় স্বার্থে তারা বলেন না। তবে, সকলের না বলা কথার গোপন রহস্য ফাঁক ও প্রকাশ করেছেন মার্কস। মার্কসই যথার্থভাবে ও যথাযথভাবে প্রমাণ ও নিশ্চিত করলেন- পুঁজি উৎপন্ন হয় শ্রম হতে। অর্থাৎ পণ্যের উপাদান দুটোর একটি - প্রাকৃতিক সম্পদ মূল্যহীন বলে অপর উপাদান শ্রমই পণ্যে মূল্য সংযোজন করে। তাই শ্রম শক্তি বিক্রিকারী শ্রমিকই উৎপন্ন করে মূল্য অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি।

সমতূল্যে বা তূল্যমূল্যে বিনিময়হীন মূল্য গ্রহণ তথা অপরের শ্রম আত্মসাৎ/ভোগ-ব্যবহার করা যেহেতু অন্যায্য, অন্যায় ও অপরাধ সেহেতু ন্যায্য ও ন্যায়সংগতভাবেই পরজীবীমাত্রই অন্যায়কারী ও অপরাধী। তাই, পরজীবীতার উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই প্রকৃতই জন্মসূত্রে চরম অপরাধী । তবু তারা পরজীবীতার প্রবর্তক-সংরক্ষক ও সুবিধাভোগী রাজকীয় কর্তৃত্বকে ঈশ্বরের অংশীদার বা উত্তরাধিকার গণ্যে নিজেদেরকে ঈশ্বরের সেবক-পূঁজক মহা মনিষী সাজিয়ে পরজীবীতার স্বার্থে ও স্বপক্ষে তৈরী করেছে নানান নিয়ম-নীতি, মতাদর্শ-বিশ্বাস,আইন-কানুন, বিধি-বিধান, রীতি-ঐতিহ্য ইত্যাদি। পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতিজীবীরাও তাই।
অত:পর, পরজীবীতার পরিপন্থী বা তদার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তদানুরূপ ক্রিয়াদি অর্থাৎ পরজীবীদের সৃষ্ট-প্রণীত আইন-বিধি,নীতি-নৈতিকতা, সংস্কার ইত্যাদি ভংগ-অস্বীকার ও অমান্যকরণকে তঞ্চকতামূলে অপরাধ গণ্য করে, এবং তদার্থে প্রকৃত অপরাধীদের সংজ্ঞায়িত ও সাব্যস্তকৃত অপরাধ সংঘটন হতে মানুষকে বিরত রাখার মাধ্যমে পরজীবীতার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখার জন্য প্রভু বন্দনা-পূঁজা ইত্যকার নানান আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানাদির যেমন প্রচলন করে তেমন অনুরূপ অপরাধে যুক্তদের দন্ড বিধানের বিহীতাদি করেছে বটে রাজকীয় কর্তৃত্বই। তাতে, প্রহসনমূলকভাবে প্রকৃত অপরাধীরাই পরিত্রাতা ও বিচারক সাব্যস্ত হয়েছে।
উপরন্ত, পরজীবীদের পরজীবীতার সুযোগ অক্ষুন্নকরণে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জীবনোপকরণ সৃষ্টিকারীদেরকেই জন্মসূত্রেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অত:পর,বানোয়াটি মূলে স্বীকৃত জন্ম অপরাধীদের অপরাধের পথ হতে দুরে রাখতে অর্থাৎ সদা-সর্বদা পরজীবীদের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে ধর্মবেত্তা-দার্শনিক, জ্ঞানী-গুণী পন্ডিত, সভা কবি-রাজ কবি, গায়েন বা সাধক-পূঁজক প্রমুখদের এক কুলিন বর্ণের গোত্র বিশেষ জন্ম দিয়ে উচ্চবর্ণীয়দের বলা হল বুদ্ধিজীবী তথা সমাজের মাথা ।
তবে, কেবল ভুয়া মতবাদিক বাতারণ বা আচার-আচরণ দ্বারা বাধ্যগত রাখা যাবে না দাসদের তা- নিজেদের ভোগ-লিপ্সা ও জন্ম ইতিহাস হতে জানতো পরজীবীরা। তাই, জীবনহানি সহ নানান ধরণের কষ্ট-যন্ত্রণা ও পীড়া দ্বারা দাসদের দাসত্ব তথা প্রভুর প্রতি

আনুগত্য বজায় রাখতে অর্থাৎ প্রকৃত অপরাধীদের বানানো ও বানোয়াটি মানদন্ডে আইন ভংগকারীদের দন্ড বিধানে অর্থাৎ রাজকীয় কর্তৃত্বে স্থিরকৃত রাজাজ্ঞাধীন প্রত্যেকের যা যা করণীয় তা তা করা , এবং যা যা না করণীয় তা তা না করার জন্য বাধ্যগত রাখতে উপযুক্ত দন্ড বিধানে অর্থাৎ রাজকীয় বিধি-বিধান ভংগ-অমান্য ও লংঘিত ও অকার্যকর হবে এটা জানতো বটে রাজকীয় কর্তৃত্ব; আর যদি তাই হয় তবেতো পরজীবীরা পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা হারাবে; তাইতো পরজীবীদের পরজীবীতার তাবৎ সুযোগ-সুবিধা যাতে বিপন্ন ও বিঘ্ন না হয়, বরং তা যথাবিহীত বলবৎ থাকে এবং তা কার্যকর রাখতে পর্যায়ক্রমে বুদ্ধিজীবীদের অংশ বিশেষকে বিচারিক কাজকারবারে নিয়োজিত করা হয়েছে। অত:পর,অপরাধ ও দন্ড তথা তদার্থে বিচারিক ক্রিয়া আর পরজীবীতা সমবয়সী। এবং যথারীতি-বুদ্ধিজীবী তথা মহা প্রতিভাধর, মহান মুনি, মহৎ ঋষি, মহা মানব, গুর-মহা গুরু, ধর্মবেত্তা, দার্শনিক, বিচারক, আইনজীবী, কবি, গায়েন ইত্যকার পরজীবীরা কম-বেশ পরজীবীতার সমবয়সী ও পরজীবীতার সুযোগ হতে উদ্ভুত। তবে, অপরাধ, অপরাধী, বিচারার্থী ও বিচারক, এবং দন্ড ও মওকুফ বা মার্জনা যতোদিন সমাজ ও ভাষায় স্থান পাবে ততোদিন প্রকৃতার্থেই মানুষ অসভ্যতা ও অমর্যদার কলংক-কালিমা হতে মুক্তি পাবে না।

পরিহাস হলেও এটিই সত্য যে, সৎ ও সততা, ন্যায়নীতি,বা নীতি- আদর্শ, ইত্যকার যে সকল ভাবাবেগপূর্ণ বানোয়াটি বক্তব্য এখনো মানুষের মধ্যে আধিপত্য করছে তা কেবলমাত্র পরজীবীতার স্বার্থে রাজকীয় কর্তৃত্ব ও পরজীবী বুদ্ধিজীবী কর্তৃক প্রণীত ও কার্যকৃত বলেই তা প্রকৃতই অসৎ ও অসততা, অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিক এবং অনৈতিক। কাজেই, সৎ-অসৎ, সততা ও অসততা, ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি বা আদর্শ নীতি এবং দুর্নীতি ইত্যকার বিষয়ক সংজ্ঞা ইত্যাদি প্রকৃতই ভুয়া,মিথ্যা , কৃত্রিম ও বানোয়াটি। কাজেই, শ্রেণী বিভাজনের পর শ্রেণী বিভাজনের পক্ষে কার্যকর এতদসংক্রান্ত আদর্শ, সুনীতি ও নীতি-নৈতিকতা কার্যতই ভন্ডামি, প্রতারণা ও দুর্নীতি।

দাসপতি, ভূমিপতি, পুঁজিপতি এবং তাদের সহযোগি ও সমর্থক পরজীবীদের স্বার্থ-স্বত্ব ও স্বামীত্ব রক্ষার স্বার্থে সৃষ্ট সকল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ও বাণিজ্য সহযোগি প্রতিষ্ঠান, তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান ইত্যকার তাবৎ প্রতিষ্ঠান, সংগঠন-সংস্থার যাবতীয় ব্যয়ভার যুগিয়েছে ও যোগায় -দাস, ভূমিদাস ও মজুরি দাস। কাজেই, রাজা-বাদশা, দেবতা-সম্রাট, মন্ত্রী-সেনাপতি ও বিচারপতি সমেত সকল রাষ্ট্রজীবী, রাজনীতিজীবী ও বাণিজ্যজীবী , তাদের সহযোগি বুদ্ধিজীবী তথা আইনজীবী, ধর্মজীবী, এবং সন্যাসী গয়রহ সকলেই উদ্বৃত্ত-শ্রম বা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারী; তাই তারা সকলেই পরজীবী। সুতরাং, পরজীবী সমেত পরজীবীতার সকল প্রতিষ্ঠান-সংস্থা ও সংগঠন মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক ও শত্রু।
তাইতো, উদ্বৃত্ত-শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত সামগ্রী বা উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নের ইতিহাস ৫ হাজার বছরের বেশী হলেও মাত্র উনবিংশ শতাব্দির পুর্বে উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব আবিস্কৃত-ব্যাখ্যাত ও সংজ্ঞায়িত হয়নি। তবে যিনি তা আবিস্কার করেছেন তিনি কোন মহা মনিষী বা এরূপ

তকমাধারী কেউ নয়, বরং স্রেফ একজন মানুষ, অর্থাৎ শ্রেণীহীন-সাম্যতন্ত্রী; এবং তিনি নন -মহা মানব বা ভয়ানক মেধাবী বা বিশিষ্ট্য বা বিস্ময়কর প্রতিভা বা ক্ষণজন্মা মুনি-ঋষি বা মহান শিক্ষক বা মহান নেতা বা বিশ্ব সংস্কারক বিশেষ তথা পরজীবীতার পক্ষীয় নন। তাই মার্কস সত্য সন্ধানী শ্রম নিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী; এবং অতি অবশ্যই মূল্য স্রষ্টা শ্রমিক শ্রেণীর অকৃত্রিম সাথী-বন্ধু এবং বিপ্লবী।

প্রশ্ন উঠতে পারে মার্কসের পূর্বে আর কেউ কেন উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব আবিস্কার করতে পারেনি? সহজ উত্তর হতে পারে উদ্বৃত্ত-সামগ্রী বা উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগীরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের গূঢ় রহস্য উন্মোচিত করতে চায়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত মার্কসের পুঁজি গ্রন্থের ১ম অধ্যায়-পণ্য, ৮৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত বক্তব্যটিই যথার্থ বলে চিহ্নিত হতে পারে যা এই: " গ্রীক সমাজের ভিত্তি ছিল দাসত্ব , এবং সেই জন্যই মানুষের এবং তাদের শ্রমশক্তির বৈষম্য ছিল তার স্বাভাবিক বুনিয়াদ। যেহেতু সমস্ত শ্রমই সাধারণভাবে মনুষ্য-শ্রম, সেই হেতু এবং সেই হিসাবেই, সর্বপ্রকার শ্রমই সমান এবং পরস্পরের প্রতিরূপ, এই হল মূল্য প্রকাশের গুপ্ত রহস্য; কিন্তু মানুষ মানুষের সমান এই ধারণা যতক্ষণ না জনতার মনে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় ততক্ষণ সে রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা যায় না। আর সেটা শুধু সেই সমাজেই সম্ভব যেখানে শ্রম দ্বারা উৎপন্ন রাশি রাশি দ্রব্যসম্ভার পণ্যরূপ ধারণ করে এবং যার ফলে মানুষের সংগে মানুষের মুখ্য সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় পণ্যের মালিকদের পারস্পারিক সম্পর্ক।"

কাজেই, পণ্য উৎপন্নকারী পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বৈ দাস ও ভূমিদাস সমাজে উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব সূত্রায়ন বা তত্ত্বায়নের সুযোগ ছিল না।

উল্লেখ্য, অনুপাতের হেরফের হলে শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতা সহ নানান জটিলতা দেখা দেয় বটে, তবে মানুষের জন্মকালীন ইলিমেন্ট প্রত্যেকের সমান। অর্থাৎ ৪৬ জোড়া ক্রমোজমই প্রত্যেকে মানুষের জন্ম উপাদান। তাইতো জন্মশর্তে মানুষের গুণাবলীর তারতম্য হওয়ার সুযোগ না থাকলেও সামাজিক-রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার তারতম্য বা অনুকুল ও প্রতিকুল অবস্থা-সুযোগ, সুবিধা ও অসুবিধার তারতম্যে মানুষ ছোট-বড় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। কিন্তু, পণ্য উৎপাদনের সমাজ বিশেষত আধুনিক শিল্প-মানুষে মানুষে সমতার লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ও দৃশ্যমান হওয়ার অনুকুল সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কার্যত, বৈষম্যপূর্ণ পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থাই তার স্ব-বিরোধী চরিত্র দ্বারা ক্রমেই আধুনিক যন্ত্রপাতি সমেত আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন-উদ্ভাবন দ্বারা একটি পণ্য উৎপন্নে বহুভাবে ও বহু বিভাগে বহু মানুষের অংশ গ্রহণের আবশ্যকতা ও সুযোগ সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে সমতার ভিত্তি যোগিয়ে যাচ্ছে।

পুঁজি তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিণতি - শ্রেণী বিভাজনের অবসান ইত্যকার বিষয়াদি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন মার্কস তার 'পুঁজি' গ্রন্থে। অত:পর, পুঁজি গ্রন্থের ভিত্তিতে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে উদ্বৃত্ত-মূল্য বিবৃত-ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হল। তবে, দাসপতি, ভূমিপতি যুগে নয়, পুঁজিপতিদের যুগে আবিস্কৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য এর যুগ তথা পুঁজিতন্ত্রী সমাজ চিহ্নিত ও নির্দিষ্টকরণে পুঁজি গ্রন্থের প্রথম বাক্য এই: : " The wealth of those societies in which the captalist

mode of production prevails, present itself as " an immense accumulation of commodities," its unit being a single commodity."
বাংলা অনুবাদে যা: "ঐ সমস্ত সমাজ গুলির মধ্যে যেটিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি বিরাজিত সেখানে "পণ্যের এক অতিকায় পুঞ্জিভবন" হিসাবে, সম্পদ নিজেকে উপস্থাপন করে, ইহার একক সত্তা হচ্ছে এক একটি পণ্য।" কাজেই, পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা মানে- পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা। তাই, পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় পুঁজিতন্ত্রী যুগের উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং, পণ্য উৎপাদনে উপায়, উপাদান বা উপকরণ ও উৎপন্নকারী চিহ্নিত-শনাক্ত হলে পুঁজিতন্ত্রী যুগের উদ্বৃত্ত-মূল্য পাওয়া যাবে।

সূর্যের আলো, সমুদ্র-বরফ ও বৃষ্টির পানি, বায়ু, খনিজ পদার্থ, ভূমি এবং বন-জংগলের বৃক্ষের ব্যবহার উপযোগিতা থাকলেও তাদের নিজস্ব কোনো মূল্য নাই। কিন্তু, মানুষ যখন ঐ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ এর উপর শ্রম প্রয়োগ করে তখন তাতে মূল্য সৃষ্টি হয়। যেমন বায়ুর মধ্যেকার অক্সিজেন ব্যবহারের কোনো বিনিময় মূল্য প্রয়োজন নাই। কিন্তু , যখনই রোগীর বা অন্য কোনো কারণে তা ব্যবহারের জন্য সিলিন্ডারে পূর্ণ করা হয়, তখন তা বিনিময় মূল্যের বিনিময়ে ব্যবহার করতে হয়। কারণ, সিলিন্ডার নির্মাণে ব্যবহৃত লোহাসহ অপরাপর সামগ্রী উত্তোলন-সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণে যেমন শ্রম শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তেমন বায়ু হতে অক্সিজেন সিলিন্ডারে ভরতেও শ্রম প্রয়োগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে শ্রম শক্তি নিজেকে যে পরিমাণে অংগীভূত বা নিষিক্ত করেছে সে পরিমাণেই তাতে মূল্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ঐ পরিমাণটা সামাজিক অবস্থা দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং, শ্রমই হচ্ছে মূল্য স্রষ্টা। কাজেই, উক্ত সিলিন্ডার ভরতি গ্যাস তথা অক্সিজেন নামীয় পণ্যটি উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম শক্তি ব্যবহার হয়েছে তথা যে পরিমাণ শ্রম সময় লেগেছে সেই সময়ের পরিমাপেই অর্থাৎ পণ্যের ভিতর যে পরিমাণ সমাজিক শ্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তার অর্থ নাম হল দাম। কাজেই, পণ্যের বিনিময় মূল্য বা পণ্যের অর্থ নাম- দাম, হচ্ছে তার মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রম এর পরিমাণ।

সাগরের পানিও নিজে নিজে মূল্যহীন। কিন্তু, উপকূলে বাঁধ দিয়ে সাগরের পানি আটকিয়ে যখন জমানো হয় এবং ঐ জমানো পানি হতে লবনাক্ত মাটি লবন উৎপন্নের জন্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন ঐ কাঁচামালই পণ্য বিধায় তা উৎপন্নে যে পরিমাণ শ্রম সময় লেগেছে সেই পরিমাণ মূল্য উৎপন্ন হয়েছে হেতু সেই সময়ের পরিমাপে লবনাক্ত মাটির দাম নির্দিষ্ট হয়। আবার লবন ফ্যাক্টরীতে ঐ লবনাক্ত মাটি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে শ্রমিকের শ্রম শক্তি প্রয়োগ তথা শ্রম যুক্ত করে বিশুদ্ধ লবন উৎপন্ন করা হয়। এতে কাঁচামালসহ ফ্যক্টরির ব্যবহার তথা যন্ত্রপাতি ক্ষয়-ক্ষতি বাবত মূল্য তথা শ্রম যে পরিমাণে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ লবনে সংযোজিত হয় তার সাথে তা উৎপন্নে যে পরিমাণ শ্রম যুক্ত হয়েছে, তা অর্থাৎ উক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ লবন উৎপন্নে পূর্বাপর সংযোজিত সকল শ্রমের যোগফল হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ লবনের মূল্য । অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ লবন সেই দামেই বাজারে বিক্রি হয় ঠিক তাতে যে পরিমাণ মোট শ্রম সংযোজিত হয়েছে। আবার, ইলিশ মাছ সাগরের পানিতে জন্মে মরে গেলেও তা মূল্যহীন; কিন্তু শ্রম প্রয়োগ করে ইলিশ মাছ শিকার করে যখন বাজারে নেওয়া হয় তখন মাছ শিকারে ব্যবহৃত নৌকা বা জাহাজ ও জালের আনুপাতিক

হারের ব্যয় ও তার সাথে শিকারীদের যে পরিমাণ শ্রম যুক্ত হয় তার সমপরিমাণ দামেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ বিক্রি হয়। অর্থাৎ শ্রমোৎপন্ন ব্যবহরোপযোগি দ্রব্যগুলি উৎপাদনে ব্যয়িত মনুষ্য শ্রমের বস্তুরূপ হচ্ছে মুল্য। তাই প্রতিটি পণ্য বিক্রি হয় তার মধ্যে অংগীভূত শ্রমের মুল্যে। কাজেই, প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলই শ্রমের সংস্পর্শে পণ্যে বা দ্রব্যে পরিণত হয়। সুতরাং, প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, শ্রমই উৎপন্ন করে মুল্য। তাই অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ মুল্যহীন। কাজেই, পণ্যের উপাদান মাত্র দুটি- (১) প্রাকৃতিক সম্পদ; এবং (২) শ্রম।

পণ্য মাত্রই বিনিময়যোগ্য একটি সামাজিক পদার্থ; এবং যে কোনো পণ্য যে কোনো পণ্যের সহিত বিনিময়যোগ্য ও যথারীতি বিনিময় হয়। উৎপন্নে কম পরিমাণ শ্রম ব্যবহৃত হয় বলে লবনের দাম কম হতে পারে। কিন্তু, ১ কেজি ইলিশ মাছের সহিত ২৫ কেজি লবনের ঠিকই বিনিময় হয়। অথবা, ২০০ কেজি ইলিশ মাছের বিনিময়ে পাওয়া যাবে এক আউন্স সোনা। কারণ ১ অউন্স সোনা উত্তোলনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয় ২০০ কেজি ইলিশ মাছ আহরণেও সেই পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয়েছে। আবার ২৫ কেজি লবন উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম লেগেছে ১ কেজি ইলিশ মাছ আহরণে সেই পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয়েছে। সুতরাং, পণ্যে শ্রম সমতা লাভ করে।

এ প্রসংগে মার্কস পুঁজির ১ম ভাগ, ১ম অধ্যায় –পণ্য, পৃষ্টা-১০৩ এ লিখেছেন- “শ্রমোৎপন্ন পণ্যগুলি মুল্য হিসাবে একটি সমরূপ সামাজিক সত্তা লাভ করে কেবল বিনিময় হয়েই, সেই সত্তা উপযোগের সামগ্রী হিসাবে সেগুলির অস্তিত্বের বহুবিদ রূপ থাকে। উপযোগি দ্রব্য এবং মুল্য এই দুই ভাগে একটি উৎপাদের এই যে বিভাগ এর গুরুত্ব কার্যত ধরা পড়ে তখনই, যখন বিনিময় প্রথা এতদুর প্রসারিত হয়েছে যে উপযোগি দ্রব্য উৎপন্ন করা হয় বিনিময়ের উদ্দেশ্যে, সুতরাং মুল্য হিসাবে তাদের চরিত্র পরিগণিত হতে হয় আগেই, উৎপাদনের সময়েই। এই মুহূর্ত থেকে ব্যক্তিগত শ্রম সমাজগতভাবে দ্বিবিধ চরিত্র লাভ করে। একদিকে শ্রম হবে একটা নির্দিষ্ট প্রকারের উপযোগি শ্রম, তার দ্বারা সমাজের কোনো নির্দিষ্ট অভাব দুরীভূত হবে, এবং এইভাবে তা পরিগণিত হবে সমাজের সকলের সমবেত শ্রমের অংশরূপে, স্বত:স্ফর্তভাবে সমাজের যে শ্রম-বিভাজন গড়ে উঠেছে তারই একটি শাখাস্বরূপ। অন্যদিকে, একজন উৎপাদনকারী নিজেরই যে বিচিত্র চাহিদা আছে এই শ্রমদ্বারা তার পরিপূরণ শুধু ততটাই সম্ভব, যতটা সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত শ্রমের এককের সংগে অপরের বিনিময়যোগ্যতা একটা সামাজিক ঘটনা, সুতরাং যখন প্রত্যেকটি উৎপাদকের ব্যক্তিগত উপযোগি শ্রম অন্য সকলের শ্রমের সংগে সমতা লাভ করে। বিভিন্ন ধরণের শ্রমকে সমগুণসম্পন্ন করা যায় শুধু তাদের অসমতা থেকে একটা বিমূর্তনের ফলে, কিংবা তাদের সাধারণ ‘হর’- এ তাদেরকে পরিণত করে; সেই সাধারণ ‘হর’ হল মানুষের শ্রম শক্তির ব্যয় অথবা বিমূর্ত মনুষ্য-শ্রম। ব্যক্তিগত শ্রমের এই দ্বিবিধ সামাজিক চরিত্র মানুষের মস্তিষ্কে যখন প্রতিফলিত হয় তখন তা কেবল সেই সব রূপে প্রকাশ পায় যেগুলি দৈনন্দিন দ্রব্য-বিনিময় তার উপর এঁকে দেয়। এইভাবে, তার নিজের শ্রম যে সামাজিকভাবে উপযোগি চরিত্রসম্পন্ন এই সত্যটি একটি শর্তরূপে হাজির হয়, শর্তটি এই যে দ্রব্যটি কেবল উপযোগি হলেই চলবে না, তা অপরের পক্ষে উপযোগি হওয়া চাই, এবং অন্য সমস্ত বিশেষ ধরণের শ্রমের সংগে সমান হওয়ার সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন তার বিশেষ শ্রম এই

রূপটি ধারণ করে যে শ্রমের ফলে উৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্যের একটি সমগুণ আছে, যথা মূল্য থাকার গুণটি।

সুতরাং, আমরা যখন আমাদের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে মূল্য হিসাবে পরস্পরের সংগে সম্পর্কিত করি, তখন তা এই জন্য করি না যে সমগুণসম্পন্ন মনুষ্য-শ্রমের আধার বলে তাকে চিনতে পেরেছি। বরং ঠিক তার বিপরীত কারণে তা করি: যখনই বিনিময়ের দ্বারা আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যকে মূল্য হিসাবে সমান করে দেখাই, তখনই ঐ সমস্ত দ্রব্যের জন্য ব্যয়িত নানা ধরণের শ্রমকে মনুষ্য-শ্রম হিসাবে সমান করে দেখাই। এ বিষয়ে আমরা সচেতন নই, কিন্তু তবু তা করি।* কাজেই মূল্য তার গলায় নিজের পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। বরং মূল্যই প্রতিটি দ্রব্যকে এক একটি সামাজিক চিত্রময় ভাষায় পরিণত করে। পরবর্তীকালে আমরা আমাদের নিজস্ব সামাজিক উৎপাদগুলির রহস্য আবিস্কার করার জন্য সেই চিত্রময় ভাষায় পাঠোদ্ধার করি, কেননা ভাষা যেমন একটি সামাজিক সত্তা, উপযোগি একটি পদার্থের উপর মূল্যসংজ্ঞার আরোপও তেমনি একটি সামাজিক ক্রিয়া। শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যগুলি, সেগুলি মূল্য বলেই, সেগুলির উৎপাদনে ব্যয়িত মনুষ্য শ্রমেরই বস্তুরূপ, ”

মার্কসের পুঁজি গ্রন্থে বিবৃত মতে- শ্রম হচ্ছে মানুষের জৈবদেহের ক্রিয়া। এই ক্রিয়ায় মানুষের মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতির ব্যয় হয়। পুঁজিপতি কাজে লাগাবার জন্য শ্রম শক্তি ক্রয় করে; এবং শ্রম শক্তির ব্যবহারই শ্রম। শ্রম এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অংশ গ্রহণ করে এবং মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৃতি ও তার নিজের মধ্যে বৈষয়িক ঘাতপ্রতিঘাতগুলি সূচনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক উপাদানগুলি হল: মানুষের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ খোদ কাজ, সেই কাজের বিষয়বস্তু ও তার উপরকরণাদি।

শ্রম শক্তি বা শ্রম করার ক্ষমতা হচ্ছে একজন মানুষ যে সব মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী তারই সমগ্রতা। শ্রম শক্তির মূল্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবনধারণের উপায়ের মূল্য। শ্রম শক্তির মূল্যের সর্ব নিম্ন সীমা নির্ধারিত হয় সেই সব পণ্যের মূল্য দিয়ে যেগুলির দৈনিক যোগান ছাড়া শ্রমিক তার কর্ম ক্ষমতা ফিরে পায় না। তবে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনী প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে নতুন নতুন শ্রমিকের যোগান তথা শ্রমিকের পুনরুৎপাদনের জন্যও পুঁজিপতি মূল্য দিয়ে থাকে।

সকল পণ্যই দ্রব্য, তাই বলে সকল দ্রব্য পণ্য নয়। কেবলমাত্র যে সকল দ্রব্য উৎপন্নকারী নিজের ভোগ-ব্যবহার নয়, কেবলই বিনিময়ের মাধ্যমে অপরের চাহিদা পূরণে উৎপন্ন করে , সে সকল দ্রব্যই কেবলমাত্র পণ্য। কাজেই, যে কোন দ্রব্য পণ্য হতে হলে তার যেমন ব্যবহার উপযোগিতা থাকতে হবে, তেমন তার বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। কাজেই, বিনিময় মূল্যহীন সকল ব্যবহার উপযোগি বস্তুই দ্রব্য। দ্রব্য বা পণ্যের মূলত দুটি উপকরণ- একটি প্রাকৃতিক; অপরটি মানুষের শ্রম। তাই, শ্রমোৎপন্ন সামগ্রী হচ্ছে দ্রব্য বা পণ্য। কাজেই পণ্য উৎপন্ন হয় শ্রমে। সুতরাং পণ্যের মূল্য হচ্ছে মনুষ্য শ্রমের বস্তুরূপ।

কাজেই, মূল্যরূপে সমস্ত পণ্যই হল ঘনীভূত শ্রম-সময়ের বিশেষ বিশেষ পরিমাপ মাত্র। সমস্ত শ্রমই সাধারণভাবে মনুষ্য শ্রম, তাই সর্ব প্রকার শ্রমই সমান এবং পরস্পরের

প্রতিরূপ। সুতরং, কোনো পণ্যের মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় তাতে নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ, তথা সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দ্বারা। তাই, বিভিন্ন পণ্যের বিনিময় দ্বারা তাদের মূল্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং পণ্যগুলির মূল্যের পরিমাণ দ্বারাই তাদের বিনিময়ের অনুপাত নিয়ন্ত্রিত হয়। অত:পর, বিনিময় মূল্য হচ্ছে একটি পদার্থের মধ্যে কী পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ করবার একটি সামাজিক পদ্ধতি। সুতরাং, মূল্য নির্ধারণে প্রকৃতির কোন ভূমিকা নাই। তাছাড়া, এক পণ্য অপরাপর পণ্যের মধ্যে নিজেরই একটি রূপায়িত আবির্ভাব দেখতে পায়। সুতরাং, পণ্য জন্মসূত্রেই সমতাবাদী এবং যেমন জন্মে তেমন ব্যবহারেও পণ্য সামাজিক।

মূল্য উৎপন্নকারী শ্রমিক উৎপাদ হতে শ্রমের পরিমাণ মতো হিস্যা পেলে কেউ কাউকে শোষণ করার কথা উঠতো না। কিন্তু, পণ্য উৎপাদনকারী পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ভিত্তি ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে পণ্যের মালিক পুঁজিপতি তা না দিয়ে মূল্যের যে অংশ নিজেই আত্মসাৎ করে তাহাই উদ্বৃত্ত-মূল্য। অন্য কথায় পণ্যের ভিতর যে শ্রম বাস্তবায়িত থাকে তার অর্থ নাম হল দাম। এখন পুঁজিপতি যদি শ্রমিককে তার শ্রমের দাম দিয়ে দেয় তবে পুঁজিপতির কোনো লাভ বা মুনাফা থাকার সুযোগ নাই। কাজেই,শ্রমের দাম নয়, শ্রমিককে পুঁজিপতি যা দেয় তা হচ্ছে মজুরি। অত:পর, মজুরি পরিশোধের পর মূল্যের যে অংশ অদেয় থাকে পুঁজিপতির জন্য তাহাই উদ্বৃত্ত-মূল্য। অর্থাৎ পণ্যের অপরিশোধিত অংশ উদ্বৃত্ত-মূল্য।

যেমন- কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, দালান ইত্যাদি খাতে পুঁজিপতি যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে তা হল স্থির পুঁজি। স্থির পুঁজিতে ইতোপূর্বে নিষিক্ত শ্রম যা নতুন পণ্যে সংযোজিত হয় মাত্র। তাই স্থির পুঁজি হতে কোনো মূল্য সৃষ্টি হয় না । শ্রমিকের মজুরি বাবত অর্থাৎ শ্রমিকের পণ্য- শ্রম শক্তি ব্যবহারের পরেই শ্রমিককে কেবলমাত্র যা দেয় পুঁজিপতি নিয়ম করে তাকে অস্থায়ী পুঁজি বলা হয়। পণ্যে -স্থায়ী পুঁজির হিস্যা যা থাকে তাতে কোনো মূল্য উৎপন্ন হয় না। তাই উৎপাদিত নতুন পণ্যের দাম হতে স্থায়ী পুঁজির অংশ বিয়োগ করলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে অস্থায়ী পুঁজির অংশ। কিন্তু পণ্যটি বাজরে বিক্রি হয়, স্থায়ী পুঁজি ও অস্থায়ী পুঁজি যোগফল যা হয় সেই দামে নয়; তার চেয়ে বেশী দামে। অত:পর, উক্ত পণ্যটি বিক্রি বাবত পুঁজিপতি যে দাম পায় তা হতে স্থায়ী পুঁজি বিয়োগ করলে যা থাকে তা উৎপন্ন হয়েছে অস্থায়ী পুঁজির হিস্যা হতে। কাজেই স্থায়ী পুঁজি নয়, অস্থায়ী পুঁজি হতে মূল্য উৎপন্ন হয়।

যেমন- একটি কলম উৎপন্নে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যয়, জ্বালানী খরচ ইত্যাকার খাতে যে ব্যয় হয় তা স্থায়ী পুঁজি। ধরা যাক স্থায়ী পুঁজির পরিমাণ- ৬ টাকা। কিন্তু, কলমটির বাজার মূল্য ১০ টাকা। তা-হলে ১০ টাকা বিয়োগ- ৬ টাকা সমান ৪টাকা উৎপন্ন হয়েছে কেবলমাত্র অস্থায়ী পুঁজির অংশ বা হিস্যা অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রম হতে। অতীতের শ্রম অর্থাৎ স্থায়ী পুঁজি -৬ টাকার সাথে বর্তমান অস্থায়ী পুঁজির হিস্যায় অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমসৃষ্ট -৪ টাকা সমান মোট ১০ টাকা কলমটির বাজার মূল্য। অর্থাৎ কলমটিতে অতীতের শ্রম অর্থাৎ স্থায়ী পুঁজি নিষিক্ত হয়েছে- ৬টাকা, আর বর্তমান শ্রম অর্থাৎ অস্থায়ী পুঁজি হতে সংযুক্ত হয়েছে ৪ টাকা। তাই কলমটির বাজার দাম ১০ টাকা। কাজেই, পুঁজি নয়, বা পুঁজিপতি নয়, শ্রমিক অর্থাৎ শ্রমই উৎপন্ন করে মূল্য।

কিন্তু, পুঁজিপতি যদি প্রতিটি কলম উৎপন্ন বাবত শ্রমিককে – শ্রমিকের শ্রম শক্তি ব্যবহারের দ্বারা উৎপন্ন -৪ টাকাই প্রদান করে তবে স্থায়ী পুঁজি -৬টাকা ও অস্থায়ী পুঁজি- ৪ টাকা মোট ১০ টাকাই পরিশোধিত । ফলে- পুঁজিপতির ভাগে কোনো অর্থ থাকে না। তা- হলে পুঁজিপতিই বা কেন উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করবে? অথচ, বিনিয়োগ হতে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার জন্যই পুঁজিপতি পণ্য উৎপাদন করে এবং পণ্য হতে পুঁজিপতি অতিরিক্ত অর্থ পায়। তাই, যেহেতু স্থায়ী পুঁজি হতে কোনো অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার সুযোগ নাই সেহেতু অস্থায়ী পুঁজির হিস্যা হতে উল্লেখিত কলম নামীয় পণ্যটি বাজার দাম ১০ টাকার মধ্যে যে ৪ টাকা উৎপন্ন হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ২ টাকা মজুরি বাবত শ্রমিককে প্রদান করেছে কলম নামক পণ্যটির মালিক পুঁজিপতি।

উল্লেখ্য শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন হলেও উৎপন্ন পণ্যের মালিক কিন্তু শ্রমিক নয়। কারণ শ্রমিক যেমন তার মজুরি দ্বারা বাজার হতে কোনো পণ্য ক্রয় করলে ঐ পণ্যের বিক্রেতা যেমন আর ঐ বিক্রিত পণ্যের মালিক থাকে না তেমন শ্রমিকের পণ্য তথা শ্রম শক্তির ক্রেতা পুঁজিপতি শ্রম শক্তির বিক্রেতা শ্রমিক হতে শ্রমিকের পণ্যটি ক্রয় করার পর শ্রমিকও তার বিক্রিত পণ্যের আর মালিক থাকার সুযোগ নাই। কাজেই, চুক্তিকৃত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রম শক্তি ব্যবহারে অর্থাৎ শ্রম শক্তির ক্রিয়া- শ্রম হতে উৎপন্ন মূল্যের মালিক বটে শ্রম শক্তির ক্রেতা পুঁজিপতি। তাই, মজুরি বাবত মাত্র ২ টাকা শ্রমিককে পরিশোধ করে কলমটির মালিক পুঁজিপতি উক্ত কলম হতে হাসিল করেছে ২ টাকা। অর্থাৎ উক্ত কলমটি উপৎন্নে স্থায়ী পুঁজি -৬টাকা যোগ অস্থায়ী পুঁজি -২ টাকা মোট ৮ টাকা বিনিয়োগ করে পুঁজিপতি কলমটি বিক্রি করে পেয়েছে ১০ টাকা। ফলে- ১০ টাকা বিয়োগ ৮ টাকা সমান ২ টাকা অতিরিক্ত আয় করেছে পুঁজিপতি ৮ টাকা বিনিয়োগ করে। তবে, প্রকৃতার্থে স্থায়ী পুঁজি ৬ টাকা হতে নয়, অস্থায়ী পুঁজি ২ টাকা হতেই কলমটির মালিক পুঁজিপতির অতিরিক্ত -২ টাকা আয় হয়েছে। তাই এই ২ টাকাই পুঁজিপতির বাড়তি আয় তথা উৎপন্ন পুঁজি।

কাজেই, উল্লেখিত ২টাকা অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্ন করেছে শ্রমিক। তবে এক্ষেত্রে প্রকৃতার্থে ৮ টাকা নয়, মুলত ২ টাকা হতেই পুঁজিপতি অতিরিক্ত ২ টাকা আয় করেছে। কারণ- স্থায়ী পুঁজি ৬ টাকা নতুন পণ্য কলমটিতে মাত্র ৬ টাকাই যুক্ত করেছে , আর অস্থায়ী পুঁজি- ২টাকা কলমটিতে আরো ২ টাকা সংযুক্ত করেছে। তাই অস্থায়ী পুঁজি- ২ টাকাই কলমটিতে ২ টাকা নয় বরং ৪ টাকা পরিমাণ মুল্য যুক্ত করে পুঁজিপতির জন্য বাড়তি ২ টাকা যুক্ত করেছে। অত:পর, কলমটি উৎপন্ন করে পুঁজিপতি ২ টাকা হতে ২ টাকা আয় করেছে। তাই এক্ষেত্রে পুঁজিপতির বাড়তি আয়ের হার -১০০ %।

শ্রম- মূল্য উৎপন্নকারী হলেও উৎপাদনের হাতিয়ারদির মালিক কিন্তু পুঁজিপতি। যেহেতু পুঁজি উৎপন্ন করাই পুঁজিপতির লক্ষ্য সেহেতু পুঁজিপতি শ্রম শক্তির উৎপাদন ব্যয় অর্থাৎ একজন শ্রমিক জীবন ধারণ ও পরবর্তী প্রজন্মের শ্রমিক উৎপন্নের জন্য যে পরিমাণ পণ্য সামগ্রী ভোগ-ব্যবহার না করলে পুর্ণ দিবস শ্রম করতে পারবে না কেবলমাত্র ঐ পরিমাণ পণ্য ক্রয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ – সর্বনিম্ন মজুরি হিসাবে শ্রমিককে পরিশোধ করে। আবার শ্রমিক জীবন ধারণের জন্য যে সকল পণ্য বাজার হতে ক্রয় করে তারও দাম নির্ধারিত হয় ঐ একই নিয়মে অর্থাৎ ঐ সকল পণ্য উৎপন্নে যে পরিমাণ শ্রম অর্থাৎ সামাজিক শ্রম ঘন্টা ব্যয়িত হয়েছে তদ্বারা। অর্থাৎ মোট সামাজিক শ্রমই হচ্ছে মোট

পণ্য।অর্থাৎ পণ্য হচ্ছে সামাজিকভাবে জমাটবাঁধা শ্রম। সুতরাং, সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্যে ব্যয়িত মোট শ্রম সময়ের গড় হিসাব করে যেমন পণ্যের দাম হিসাব করা হয় তেমন শ্রমিকের মজুরিও শ্রম ঘন্টা বা শ্রম দিবস হিসাবে নির্ধারিত হয় । তাই, শ্রম শক্তির উৎপাদন ব্যয়-যা শ্রমিককে মজুরি হিসাবে প্রদান করা হয় যার পরিমাণ এক্ষেত্রে অর্থাৎ কলমটির ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি ২টাকা, অবশিষ্ট ২ টাকাও কার্যত এবং প্রকৃতই শ্রমিক কর্তৃক সৃষ্ট মূল্য'র অংশ বিশেষ যা শ্রমিককে না দিয়ে পুঁজিপতি নিজে আত্মসাৎ করে।

অত:পর, শ্রমিক শুধু মূল্য নয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যও উৎপন্ন করে,এবং তা উৎপন্ন করে পুঁজিপতির জন্য যা- পুঁজিপতি বিনামূল্যে আত্মসাৎ করে। কাজেই, পুঁজিপতির আত্মসাৎকৃত মূল্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে পুঁজি বা পুঁজি হচ্ছে শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য। সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্যই হচ্ছে পুঁজি।

অত:পর, যে সমাজে পুঁজির মালিক পুঁজিপতি- ব্যক্তিমালিকানার সুযোগ ও সুবাদে শ্রমিকের সৃষ্ট মূল্য'র অংশ বিশেষ অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ আইনত লাভ করে এবং মূল্য উৎপন্নকারী হয়েও কেবলমাত্র উৎপাদন উপায়ের মালিকানাহীন বলেই মজুর বা মজুরি দাস - শ্রমিক তার উৎপন্নের স্বত্ত্বলাভ করে না তাহাই পুঁজিতন্ত্রী সমাজ।

এ সমাজে উৎপন্ন হয় পণ্য তাই পণ্য উৎপাদনী উপায় বা হাতিয়ার হচ্ছে আধুনিক এবং সামাজিক সম্পর্ক হচ্ছে মালিক-শ্রমিক। মালিক উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকারী, আর শ্রমিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী । তাই, মালিক তথা পুঁজিপতি শোষক আর শ্রমিক শোষিত-বঞ্চিত ও প্রতারিত। অত:পর, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হচ্ছে শোষক-শোষিতের ; তাই বৈরীতামূলক তথা দ্বন্দ্বমূলক। সুতরাং, দ্বান্দ্বিক সম্পর্কাধীন সমাজ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র।

আরো উল্লেখ্য- উল্লেখিত কলমের ১০ টাকা দামের মধ্যে ৬ টাকা স্থায়ী পুঁজি, যা নতুন মূল্য উৎপন্ন করেনি, আর মজুরি -২ টাকা যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য ২ টাকা এই ৪ টাকাই কেবলমাত্র অস্থায়ী পুঁজির হিস্যা ২ টাকা হতে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু কলমটি উৎপন্নে দেয় মজুরি অর্থাৎ ২ টাকা উৎপাদনে ৮ ঘন্টা নয়, মাত্র ৪ ঘন্টা শ্রম সময় ব্যয়িত হয়েছে। উপরন্ত শ্রমিক শ্রম শক্তি প্রয়োগ বা শ্রমের মাধ্যমে কলমটি উৎপন্ন করার পরই পুঁজিপতি নিয়মানুযায়ী শ্রমিককে মজুরি প্রদান করেছে। তাই, কলমটির ক্ষেত্রে ৪ শ্রম ঘন্টার মূল্য তথা মজুরি প্রদান করে শ্রমিককে ৮ শ্রম ঘন্টা খাটিয়েছে। তাই, কলমটি উৎপন্নে ৮ শ্রম ঘন্টা বিয়োগ ৪ শ্রম ঘন্টা সমান ৪ শ্রম ঘন্টার মূল্য শ্রমিককে প্রদান না করে ঐ ৪ শ্রম ঘন্টা বা ঐ ৪ শ্রম ঘন্টায় উৎপন্ন ২টাকা পুঁজিপতি আত্মসাৎ করেছে। কাজেই শ্রমিক এক্ষেত্রে নিজের জন্য ৪ ঘন্টা শ্রম প্রয়োগ করে তার মজুরি তথা ২ টাকা পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করেছে , আর উদ্বৃত্ত ৪ ঘন্টা শ্রম প্রয়োগ করে পুঁজিপতির জন্য ২ টাকা উৎপন্ন করেছে। অর্থাৎ শ্রমিকের উদ্বৃত্ত সময়ের আয় ২ টাকা পুঁজিপতি অপহরণ করেছে চুক্তিমুলে । অর্থাৎ এই ৪ ঘন্টার শ্রমের জন্য পুঁজিপতি শ্রম শক্তি বিক্রেতাকে কোনো মূল্য পরিশোধ করেনি। কাজেই, পুঁজি হচ্ছে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত সময়ের শ্রম বা শ্রমিককে অদেয় শ্রমের দাম বা পণ্যের যে অংশের দাম পুঁজিপতি পরিশোধ করেনি। অত:পর, পুঁজিপতি বা পুঁজি নয়, শ্রমিক তথা শ্রমই উৎপন্ন করে মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যও অর্থাৎ পুঁজি। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে শ্রমিক নয়, পুঁজির মালিক হচ্ছে বটে পুঁজিপতি। তাই, পুঁজিপতিদের সমাজ হচ্ছে - পুঁজিতন্ত্রী সমাজ।

পুঁজিতন্ত্র

(১) জন্মের প্রায় ২লাখ বছরে মানবজাতি তার চতুর্থ সমাজ- যা পুঁজিতন্ত্র বলে চিহ্নিত তাতে বসবাস করছে। মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্য বা বৈরীতা ছিল না অর্থাৎ ছিল না শ্রেণী ও শ্রেণী বিভাজন। ঐ আদিম সমাজ চিরস্থায়ী হয়নি তেমন দাস ও ভূমি দাসত্বের সমাজও টিকেনি। ভূমি দাসত্বের সামন্ত সমাজই জন্ম দিয়েছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের, যার সূত্রপাত ঘটেছে মাত্র ১৩০০ সালে রোম সাম্রাজ্যের ইটালীতে। প্রধানত দ্রব্য উৎপন্নকারী অতীতের অপরাপর সমাজ হতে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের তফাৎ হচ্ছে এই যে, পণ্যের এক অতিকায় পুঞ্জিভবন হিসাবে সম্পদ নিজেকে এখানে উপস্থাপন করে এবং তার একক সত্ত্বা হচ্ছে এক একটি পণ্য। বিক্রি নয়, উৎপাদকের ভোগ-ব্যবহারের নিমিত্তে উৎপন্ন হচ্ছে দ্রব্য, আর উৎপন্নকারীর ভোগ-ব্যবহারের জন্য নয় কেবলই বিক্রির জন্য উৎপন্ন হচ্ছে পণ্য। কাজেই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে কার্যত পণ্য উৎপন্নকারী সমাজ। দ্রব্যের মতোই পণ্যের যেমন ব্যবহার মূল্য আছে তেমন দ্রব্যের যা নাই তা অর্থাৎ বিনিময় মূল্য আছে পণ্যের । তাই, পুঁজিতন্দ্রী সমাজ হচ্ছে পণ্য বিনিময়ের সমাজ। সমাজ যেটিই হোক না কেন, মানুষের বেচেঁ থাকার জন্য সর্বাগ্রে খাদ্য-পানীয় সহ বেশ কিছু উপকরণ আবশ্যক। এই সকল উপকরণাদি মানুষ উৎপন্ন বা সংগ্রহ করে। দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদনে মানুষ যে সকল হাতিয়ার ব্যবহার করে তাকে বলা হয় উৎপাদন শক্তি বা উপায় । তবে উৎপাদনী ক্রিয়া-কান্ডে মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক হয় তা-সামাজিক সম্পর্ক। কাজেই- মানুষ বাঁচার শর্তেই সামাজিক। তবে, রবিনসন্স ক্রুশো একা একা দ্রব্য উৎপন্ন করতে সক্ষম হলেও পণ্য উৎপাদিত হয় বহুজনের অংশগ্রহণে তথা সামাজিকভাবে।অর্থাৎ সামাজিক শ্রম ব্যতীত পণ্য উৎপন্ন হয় না। তাই পণ্য সামাজিক শ্রমের ফসল। যদিচ, পণ্য ও পণ্য উৎপন্নের হাতিয়ারাদির মালিকানা ব্যক্তিগত। তাই,আইনগত বৈধতা বা গ্রাহ্যতা থাকলেও অযৌক্তিক, অন্যায্য ও অন্যায়ভাবে পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজ।

(২) পণ্যের উপাদান মাত্র দুটি: (এক) প্রকৃতিক সম্পদ, (Natural Resource) যেমন সূর্যের আলো-তাপ, পানি, বায়ু, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি, যার নিজস্ব কোনো মূল্য নাই; এবং (দুই) শ্রম- যা মানুষের শ্রম শক্তির ক্রিয়া। কাজেই কোনো পণ্যের মূল্য হচ্ছে তাতে নিষিক্ত মোট শ্রম। কিন্তু, উৎপাদন ও জীবন ধারণের উপকরণের মালিক পুঁজিপতি আর দশটা পণ্যের মতো শ্রমিকের পণ্য অর্থাৎ শ্রমিকের -শ্রম শক্তিও ক্রয় করে থাকে যতারীতি ঐ পণ্যের অর্থাৎ শ্রম শক্তির উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ দাম দিয়ে যা- মজুরি হিসাবে স্বীকৃত।কাজেই, মজুরির পরিমাণ নির্ধারিত হয় পণ্য বাজারের নিয়মে। অত:পর, মজুরের ক্রিয়াশীলতা সচল রাখতে আবশ্যকীয় শক্তি আহরণে-সংগ্রহে মজুর যে পরিমাণ পণ্য গ্রহণ করে থাকে তা ক্রয়ে মজুর যে পরিমাণ অর্থৎ ব্যয় করে থাকে, সেই পরিমাণ অর্থ হচ্ছে মজুরের মজুরি। মজুরের ভোগ-ব্যবহারকৃত পণ্যের দামও নির্ধারিত হয় বটে ঐ পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের ব্যয় তথা ঐ পরিমাণ পণ্য উৎপন্নে যে পরিমাণ শ্রম নিষিক্ত

হয়েছে সেই পরিমাণ দামে। পণ্য বেচা-কেনার এটাই নিয়ম। অর্থাৎ সকল পণ্যই তার উৎপাদন ব্যয়ে বিক্রিত হয়।

শ্রম শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে শ্রম। তাই শ্রম শক্তির ক্রেতা- পুঁজিপতি শ্রম নয়, শ্রম শক্তির দাম অর্থাৎ মজুরি প্রদান করে শ্রমিককে । আবার শ্রমিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে শ্রম শক্তি বিক্রি করা ব্যতীত জীবন ধারণ করতে পারে না। অর্থাৎ আয় করার জন্য যার কোন পুঁজি নাই। শ্রমিক যেমন তার পণ্য-শ্রম শক্তির বিক্রেতা, তেমন পুঁজিপতিও শ্রম শক্তি নামক পণ্যের ক্রেতা। উভয় পক্ষ বাজারে পরস্পরের মুখোমুখি হয় স্বাধীনভাবে। তবে, যখনই শ্রমিক তার পণ্য বিক্রি করে দেয় তখন হতে শ্রমিক তার পণ্যের মালিক নয়, বরং ঐ পণ্যের ব্যবহারে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদে অভিযোজিত ইতোপূর্বেকার শ্রমে উৎপন্ন কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করে যে নতুন পণ্য উৎপন্ন করে, তার মালিক শ্রমিক নয়, পুঁজিপতি। কাজেই, শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের বা পণ্যের দামের মালিক হয় পুঁজিপতি। তাই, দুনিয়ার সকল পণ্য উৎপন্নকারী হয়েও শ্রমিক শ্রেণী নয়, কেবলই পুঁজিপতিশ্রেণীই সকল পণ্য তথা উৎপাদনের হাতিয়ার ও জীবন ধারণের উপকরণাদির মালিক। অত:পর, শ্রম শক্তি রূপ পণ্যের মালিক-শ্রমিক তার শ্রম শক্তি বিক্রি করে যে পরিমাণ মজুরি পায় তাতে প্রায় সম পরিমাণ শ্রম শক্তি উৎপন্নে প্রয়োজনীয় পণ্য ব্যতীত মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণের উপযুক্ত পণ্য পাওয়ার সুযোগ নাই। তাই, মজুরি দাস নিত্যই অমর্যাদাকর জীবনের দু:খ-দুর্দশা ও দুর্ভোগের গ্লানি ও যন্ত্রণা নিয়ে মরতে মরতে বেঁচে বর্তে থাকে সত্যি সত্যি একদিন অকালে মরে যাওয়ার জন্য ।

অত:পর, খোদ স্রষ্টাকে স্বীয় অস্তিত্বের শর্তে ধারাবাহিকভাবে নি:স্ব ও নি:শেষিত করে হত করে স্বয়ং পুঁজি। তাই পুঁজি নিজেই নিজের স্রষ্টা শ্রমিক শ্রেণীর হত্যাকারী। সুতরাং, সৃষ্টি কর্তৃক স্রষ্টা খুনের স্ববিরোধীতা ও বৈরীতার সমাজ হচ্ছে পুজিতন্ত্র।

(৩) পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পণ্য উৎপন্নকারী হচ্ছে শ্রমিক অথচ, উৎপন্নকৃত পণ্যের মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি। তাই, পুঁজিতন্ত্রে শ্রমিক মূল্য উৎপন্নকারী হয়ে মূল্য নয়, হাসিল করে মজুরি। আর পুঁজিপতি শ্রম না করেও কেবলই বিনিয়োগকৃত পুঁজি তথা ব্যক্তিমালিকানার শর্তে লাভ করে শ্রমে উৎপন্ন মূল্য হতে শ্রমিককে দেয় মজুরি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য। কাজেই, মজুরি আর উদ্বৃত্ত-মূল্য, এ'দুটোই উৎপন্ন করে শ্রমিক কিন্তু কেবলই ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে পুঁজিপতি লাভ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি। সুতরাং, পুঁজিপতি মাত্রই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকারী অর্থাৎ শোষক, এবং শ্রমিক মাত্রই শোষিত। তাই, পুঁজির জন্ম শর্তেই পুঁজিতন্ত্রী সমাজ শোষক ও শোষিত এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত । শ্রমিকের শ্রম শোষণ করা ব্যতীত পুঁজিপতি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। আবার, শোষিত হওয়া সত্ত্বেও মজুরির বিনিময়ে শ্রম শক্তি বিকি না করে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকের বেঁচে থাকার সুযোগ নাই। তাই, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করাই যেমন পুঁজিপতির লক্ষ্য তেমন উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করেও তার অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের অধিকারী নয় বলেই শ্রমিক চরম দুর্ভোগ-দুর্দশা, দৈন্যতা- নি:স্বতা, এবং দুশ্চিন্তা ও দুরাবস্থার ভয়ানক যন্ত্রণা ও অশান্তি নিয়ে জীবনপাত করে। অত:পর, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হেতুবাদে উভয় শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণী পারস্পারিক বৈরীতা-বৈষম্য, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও শত্রুতামূলক সম্পর্কের অধীন। তাই, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে,

সংগঠিতভাবে বা অসংগঠিতভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান বৈ তা হতে মুক্ত থাকার সুযোগ নাই পণ্য উৎপাদনী সম্পর্কের কারণেই তথা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হেতুবাদে। কাজেই, পণ্য উৎপাদন মানেই হচ্ছে শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ-বৈরীতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ক্ষেত্র বিশেষ বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও যুদ্ধ। অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য সংক্রান্ত বিরোধ-বৈরীতা পুঁজিতন্ত্রে মিমাংসার অতীত । সুতরাং শ্রেণী সংঘাতের পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা তথা পুঁজিতন্ত্র যেমন উদ্বৃত্ত-মূল্য বিহীন কার্যকর নয়, তেমন উদ্বৃত্ত-মূল্যের হেতুবাদে ক্ষণিকের জন্যও শ্রেণী সংঘাত, শ্রেণী বিরোধ, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, শ্রেণী বৈরীতা, শ্রেণী শত্রুতা ও শ্রেণী সংগ্রাম হতে মুক্ত নয় হেতু পুঁজিতন্ত্রী সমাজ শান্তিপূর্ণ নয় অর্থাৎ পুঁজির জন্মমুলেই পুঁজিতন্ত্রী সমাজ অশান্তির উৎস ও ভান্ডার।

(৪) যেহেতু পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকারী তাই পুঁজিপতি মাত্রই শ্রমিকের শ্রম আত্মসাৎকারী তথা শোষক- দুর্নীতিবাজ সেহেতু পুঁজিতন্ত্রী সমাজ শোষণ-পীড়ন, অনাচার-অনিয়ম ও দুর্নীতির স্রষ্টা, রক্ষক ও সংরক্ষক। তাই পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রত্যেকেই পুঁজির জন্ম শর্তে দুর্নীতি-অনাচার ও অনিয়ম করে থাকে। যদিচ, পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেদের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্য ভাগাভাগি করার ও সেরূপ হারাহারি মতো নিজ নিজ হিস্যা পাওয়া ও তা ভোগ ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা সমেত সামগ্রীকভাবে পুঁজিপতিদের সামগ্রীক স্বার্থ উপযুক্তভাবে দেখা-ভাল করার জন্য নানান আইন-কানুন পত্তন ও নবীকরণ এবং তা কার্যকরণে ভোটাভোটির রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তথা সরকার এবং রাজনৈতিক দলসহ নানান সংস্থা ও সংগঠনের উদ্ভাবন, উন্নয়ন করেছে পুঁজিতন্ত্রই। তাই, রাষ্ট্র সহ রাষ্ট্র রক্ষক-সংরক্ষক সংস্থা-সংগঠন বা তদার্থে ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিচালন ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে উদ্বৃত্ত-মূল্য হতেই। সরকারী রাজস্ব তথা ট্যাক্স, ট্যারিপ, ফিস, জরিমানা, দান, অনুদান এবং খাজনা-সুদ ইত্যকার যে নামেই তা গৃহীত বা সংগৃহীত হোক না কেন, মুলত ও প্রকৃতই এসবই উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বিশেষ মাত্র। কাজেই, জাতিসংঘ এবং আই.এম.এফ সহ আই.এম.এফের সদস্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াদির আবশ্যকীয় অংগ-বিভাগ, দপ্তর ও দল এবং তদসমর্থক তথা পুঁজিতন্ত্রের সমর্থক-সহযোগি সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদির সকল কর্তা-অধিকর্তা বা সহযোগী-পেশাদার সকলেই শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী তথা পরজীবী। তবে এসকল সংস্থা-সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানাদির নির্বাহী বা নির্বাহী সহযোগী পেশাদার সকলেই দায়-দায়িত্ব ইত্যকার গুরুত্ব ও কার্যকরতার উপযুক্ততায় স্ব-স্ব পদ-পদবী অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন-ভাতা, পারিতোষিক ও সুযোগ-সুবিধা পাবে বা তদানুরূপভাবে গ্রহণ করাটাই নিয়ম।

তৎসত্ত্বেও, জন্ম শর্তেই পুঁজিপতি যেমন দুর্নীতিবাজ তেমন পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সুবিধাভোগী সকল ধরণের পরজীবী নিজ নিজ পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা অক্ষুন্ন রাখা ও তা বাড়ানোর জন্য পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ঝগড়া-বিবাদ এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। তাই, নির্ধারিত হিস্যার চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আয় বা ভোগ ব্যবহার করা বা তদানুরূপ করার চেষ্টাকে হাস্যকরভাবে পুঁজিতন্ত্রী আইন বেত্তা, রাজনীতিক, দার্শনিক ও কবি-সাহিত্যিকরা -দুর্নীতি, প্রতারণা, চুরি-ডাকাতি বা ছিনতাই, বা জালিয়াতি-জোচ্চুরি বা অতি মুনাফা বা অসাধুতা ইত্যকার নানান তকমা

দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে অভিযুক্ত বা ক্ষেত্রবিশেষ দন্ডাদি প্রদান করার মাধ্যমে এসকল দুস্কর্মের জন্য পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা নয়, বরং দায়-দোষী গণ্য ও সাব্যস্ত করছে কার্যত পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার শর্তাধীন ব্যক্তিবিশেষকে ।

অনুরূপ চালাকি বা অর্ধসত্যের ভিত্তিতে পুঁজিতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে সৎ-সাধু , মহাজন-সজ্জন ইত্যকার নানন শ্রদ্ধার ভাবাবেগ উগ্রেগকারী অভিধায় অভিষিক্ত ও অবিহীতকরণের অপচেষ্টায় অসৎভাবে লিপ্ত থেকে পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সম্পর্কে ভুল-ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা জনমনে তথা শ্রমিক শ্রেণীর চিন্তা-চেতনায় ঠাঁই দিয়ে কার্যত যারা সজ্জন-সৎ তথা নিজের শ্রমে জীবনধারণকারী তদুপরি শোষিত শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত ও দুর্দশাগ্রস্তকরণে নানান ভান ভনিতা করে থাকে। তাই, সকল দুর্নীতি ও দুস্কর্মের উৎস-ভান্ডার পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদ তথা ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানা সংরক্ষায় নানান চল-চাতুরীর আশ্রয় নেয় বুর্জোয়ারা। যেমন উদ্বৃত্ত-মুল্য ভোগীদের যে অংশ বিশেষত সরকারী কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী যে বা যিনি নিজ নিজ হিস্যার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মুল্য ভয়ানকভাবে হাতিয়ে নেয় বা 'আংগুল ফুলে বটগাছ' বনে এবং কার্যতই যা দৃশ্যকটু সেরকম ব্যক্তিদেরকে দুর্নীতিবাজ হিসাবে চিহ্নিত করে অনুরূপ দুর্নীতিবাজদের দন্ডদান সহ কথিত দুর্নীতি বন্ধে বা হ্রাসে বা তদমর্মে নানান ধরণের আইন-কানুন, সংস্থা-কমিশন, ইত্যাদি গঠন-পত্তন, সংস্কার করার দাবীতে সভা-সেমিনার, সমাবেশ বা ক্ষেত্র বিশেষ অনশন ইত্যকার ক্রিয়া কর্ম সংগঠনে শ্রমিক শ্রেণী সহ সমাজের নিম্নবিত্তের জনগণকে প্ররোচিত, বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত করার মাধ্যমে হয়তো চিহ্নিত দু'চারজন বুর্জোয়াকে ফাঁসিয়ে দিয়ে বাহাবা নিয়ে কার্যত সকল দুর্নীতির কারণ - ব্যক্তিমালিকানাকে, রক্ষায় সচেষ্ট বটে বুর্জোয়া নীতিবাগিশ পুরোহিতবর্গ ও কথিত শান্তিবাদী ভন্ডরা।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যেহেতু পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ভিত্তি সেহেতু যার যতো বেশী পুঁজি তার ততো বেশী পুঁজি সঞ্চয়ের তথা পুজির পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ তৈরী হয়। আবার যে যতোবেশী পুঁজির মালিক তার ততো বেশী সুযোগ-সুবিধা যেমন বেশী তেমন সেই সকল সুবিধাদি অক্ষুন্ন রাখা সহ স্বীয় পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় সদা-সর্বদা সচেষ্ট বলে পুঁজিপতি মাত্রই পুঁজির শর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রীক। সুতরাং, সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পুঁজির সামাজিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতি মাত্রই সামাজিকতার বিপরীতে ব্যক্তিকেন্দ্রীক যা পুঁজিতন্ত্রের জন্মগত ও আজন্ম স্ববিরোধীতা, সংকট ও সমস্যা। এই সংকট-সমস্যা প্রতিনিয়ত তীব্র হতে তীব্রতর ও প্রকটতর করেই পুঁজিপতি শ্রেণীর বা পুঁজিতন্ত্রী মানসিকতার প্রত্যেকেই ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে প্রতিনিয়ত এক অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে- পুঁজির জন্ম সূত্র ও শর্তেই। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের বিজয়ী হওয়ার সুযোগ নাই। তবু অসম প্রতিযোগিতার অসম অবস্থায় থেকেও প্রত্যেকেই বিজয়ী হতে চায়। তাই পুঁজিপতি মাত্রই বিজয়ী হতে হেনকোনো কর্ম নাই যা করতে কুণ্ঠিত হয়, এমনকি আয়ের হার বা মাত্রা বেশী হলে ফাঁসিতে ঝুলার ঝুঁকি নিতেতেও পিছপা হয় না একদা নীতিবাগিশ-বিশুদ্ধবাদী, শান্ত ধরণের ভদ্র গোছের ভীরু ব্যক্তিকটিও। অর্থাৎ অধিকতর পুঁজির মালিক হওয়ার জন্য তারা মিথ্যাচার- প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি, ভনিতা-ভন্ডামি, নকলবাজি-চালবাজি, জোচ্চুরি- কারসাজি, ঠগবাজি-চালাকি, ফাঁকি-জুকি, শঠতা-বিশ্বাসঘাতকতা .চুরি-

ছিনতাই, দুর্নীতি-দুর্বৃত্তপনা, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, ধূর্তামি-হিংস্রতা, খুন-জখম, সন্ত্রাস-যুদ্ধ ইত্যকার তাবৎ অসভ্য-বর্বর, নিষ্ঠুর-নির্মম ও জঘন্য ক্রিয়াদি করে। অথচ, পুঁজির উচ্ছিষ্টভোগী কথিত বুদ্ধিজীবী-আইনবেত্তা ও নীতিবাগিশ ভন্ডরা তথাকথিত নীতিকথা- " অভাবে স্বভাব নষ্ট" রূপ প্রবাদ বাক্য রচনা ও প্রচার করে নিত্যই সমাজের অশান্তি, চুরি-ডাকাতি ইত্যকার অপরাধমূলক কার্যাদির জন্য গরীব মানুষকে দায়-দোষী গণ্যে বুর্জোয়াদের অকর্মণ্য পুত্র-কন্যারও নানান জাতীয় নেশার বদাভ্যাসের রসদ যোগাতে নিজের ঘরে চুরি-চামারি করলেও যেমন বাড়ীর লোকজন তেমন আইন-শৃংখলার লোকেরাও প্রথমেই সন্দেহ করে বাড়ীর কাজে নিযুক্তদের। অবশ্য গরীব মানুষদের কেউ কখনো ব্যক্তিমালিকানার লোভ-প্রলোভন ও প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে দুর্বৃত্তদের দুর্বৃত্তপনায় সহযোগী হয় না বা ভাড়া খাটে না এমন নয়।তাই বলে দুরিদ্র মাত্রই যেমন চোর নয়, তেমন বুর্জোয়ামাত্রই দুর্নীতির দায় মুক্ত নয়। উপরন্ত, দারিদ্র- পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সৃষ্টি এবং পুঁজিপতি শ্রেণী আছে বলেই দ্ররিদ্র আছে এবং ধনীর জন্যই দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্রতা বর্ধিত হলেও পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীরা প্রতিনিয়ত নানান কলা-কৌশলে প্ররোচিত করে ধনের মরিচিকার পিছনে প্রত্যেকে দৌড়াতে।

প্রমাণিত হয়েছে- এমন দৌড়ের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে কেবল ব্যক্তি বিশেষ নিজেই এককভাবে নয় বরং পারিবারিকভাবে শ্রম দিয়েও ঋণের চক্রজালে আষ্ট-পিষ্ট বন্দী হয়ে ঘর-বাড়ী হারিয়েছে বহুজন। তবু দু'য়েকজন যারা হয়তো কোনোক্রমে কিঞ্চিত সাফল্য পেয়েছে তাদের নজির টেনে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি বা গাছ- মাছ চাষ,লালন-পালন করে ধনী বনার কল্প-কাহিনী সচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে অভাবী মানুষকে ধনী বনার কল্পনিক রেইছের ঘোড়সোয়ারী বানিয়ে ধনীক গোষ্ঠীর বহুবিদ অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল সহ অলস পুঁজি সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি করে। উপরন্ত কর্ম করে শ্রমিক ধন যোগায় ধনীর আর ধনী দুস্কর্মের মাধ্যমে আরো ধনী হয়। কাজেই, কর্ম নয়, দুস্কর্মই ধনী হওয়ার গোপন রহস্য। তাই, জন্মগত শর্তে দুস্কর্মকারীরা অর্থাৎ পুঁজিপতিরা কেউই কাউকে বিশ্বাস করে না; বরং কেউ কাউকে বিশ্বাস না করাটা পুঁজিতন্ত্রী যোগ্যতা। সুতরাং, পুঁজিপতি মাত্রই সন্দেহবাতিক গ্রস্ত- আতংকিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে পুঁজিতন্ত্রী মানসিকতার প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী ও আস্থাহীন এবং শত্রু বৈ কেউ কারো স্থায়ী মিত্র নয়। কাজেই, ব্যক্তিমালিকানার স্বত্বে ও শর্তেই কেউ কারো বন্ধু হওয়ার সুযোগ নাই। তাই পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রত্যেকেই বন্ধুহীন। কাজেই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বন্ধুত্বের প্রতিবন্ধক ও শত্রু। অত:পর, প্রেম-প্রীতি বা ভালোবাসা নয়, বরং বিরহ-বৈরীতা, বিষন্নতা ও শত্রুতায় আকীর্ণ পুঁজিপতি শ্রেণী নিত্যই ভিলেন জন্ম দিয়ে সমাজে হিংসা দ্বেষ ও সন্ত্রাস ছড়ায়-বাড়ায়। সুতরাং ভয়-ভীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা, খুন-সন্ত্রাস ইত্যকার বিষয়াদি পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অংগ ও বৈশিষ্ট্য।

তাছাড়া, পুঁজিপতি শ্রেণী যাদের শ্রম আত্মসাৎ করে তারাও অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী-কর্মচ্যুতি, বাজার দামের বেলকিবাজি, অসুস্থতা ইত্যকার নানান কারণে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তা-দুশ্চিন্তা, দুর্দশা ও দুর্ভোগ নিয়ে বাঁচে। তাই তারাও চাকুরী রক্ষা সহ নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা স্বাস্থ্যসম্মত ও সুন্দর কর্মপরিবেশ ইত্যকার নানান দাবীতে যেমন সংঘবদ্ধ হয় ও আন্দোলন করে থাকে এবং শিল্প উৎপাদনের কাঠামোর মধ্যে

শিল্পই শ্রমিকদেরকে সমস্বার্থ সম্পন্ন ও সম স্বার্থে গঠিত-সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরোধী ও পুঁজিতন্ত্র বিনাশী শক্তিতে পরিণত করে। অথবা যখনই শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর ফাঁকি-জুকি ও ফেরেববাজি বুঝতে পারবে তখনই তারা আর পুঁজিপতিশ্রেণীর জন্য পণ্য উৎপন্ন করতে না চাইলে বা তা করা হতে বিরত হলে বা উৎপাদন উপায়সহ উৎপাদিত পণ্যের সামাজিক মালিকানা ন্যায়সংগত ও যথার্থভাবে দাবী করলে বা তদার্থে আন্দোলন সংগঠিত করলে বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত অস্তিত্বই বিলীন ও বিলুপ্ত হবে। তাই অস্তিত্বহীন বা বিলীন-বিলুপ্ত হওয়ার এমনতরো ভয়-ভীতি ও আশংকায় থাকতে হয় প্রতিটি বুর্জোয়াকেই।

অত:পর, অনুরূপ ভয়-ভীতি হতে রেহাই পেতে দুর্নীতি বিরোধী ভান-ভনিতা বা তদার্থে প্রহসন ইত্যাদি করা ছাড়াও ভাষা প্রেম, ধর্ম প্রেম, জাতি প্রেম, দেশ প্রেম ইত্যকার নানান ভুয়া প্রেমের জঞ্জালের ভান্ডারে শ্রমিক শ্রেণীকে নিপতিতকরণে ও তদার্থে যা যা ভন্ডামি-প্রতারণা করা আবশ্যকীয় তা তা দুনিয়ার পুঁজিপতিরা অধিক হতে অধিকতর মাত্রায় করে যাচ্ছে। আবার টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির সঞ্চালন শর্তে বাধ্য হয়ে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার করছে তাতে যেমন সরাসরি কর্মচ্যুত হচ্ছে শ্রমিক তেমন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন নতুন নতুন উৎপাদনী হাতিয়ার ব্যবহার করে নৈরাজ্যিকভাবে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করার মাধ্যমে সৃষ্ট পুঁজিতন্ত্রী সংকট ইত্যকার নানান কারণে কর্মচ্যুতি, ছদ্ম-বেকারত্ব বা বেকারত্বের শংকা নিয়ে অনিশ্চিত জীবন যাপনে বাধ্য শ্রমিক শ্রেণীও।

অত:পর,পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে ভয়-ভীতি, শংকা-আশংকা, অনিশ্চয়তা-দুশ্চিন্তা ও সন্ত্রাস ইত্যাদির জন্মদাতা- লালনকর্তা, পোষক-রক্ষক ও সংরক্ষক। অথচ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে জীবনমান ও জীবনের স্থায়ীত্ব বাড়ানো সহ প্রকৃতি জয়ে মানুষের ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও দৃশ্যগ্রাহ্য হওয়ায় প্রাচুর্যময়, দুশ্চিন্তাহীন, মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন লাভের প্রত্যাশা অতীতের যেকোনো সমাজের তুলনায় অধিক হতে অধিকতর মাত্রায় বৃদ্ধি হচ্ছে যা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ভিত্তি ব্যক্তিমালিকানার সহিত সাংঘর্ষিক ও বিরোধী । সুতরাং, ভয়-ভীতির জন্ম দিয়েও ভীতিমুক্ত জীবনের প্রত্যাশা সৃষ্টিকারী পুঁজিতন্ত্রী সমাজ স্বীয় শোষণমূলক চরিত্রদোষে স্ব-বিরোধীতায় পরিপূর্ণ।

(৫) পণ্য উৎপন্নকারী পুঁজিপতি পণ্য বিক্রি করেই পুঁজি রক্ষা ও পুঁজির পরিমাণ প্রসারিত করতে পারে। তাই, যতো বেশী পণ্য বিক্রি ততো বেশী পুঁজি আর যতো বেশী পুঁজি ততো বেশী পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা বলেই গিল্ড ও হস্ত শিল্প দিয়ে ইটালীতে জন্ম হয়ে হল্যান্ডে বিকশিত ও শিল্পের আদিভূমি ইংলন্ডে আধুনিক শিল্প কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে আধুনিক পুঁজিতন্ত্র বিকাশ লাভ করে ষোড়ষ শতাব্দীতেই। পণ্য সঞ্চালনের এই প্রক্রিয়ায় আবিস্কৃত হয় নতুন দুনিয়া, একত্রিত হয় সমগ্র ধরিত্রী যেমন পুঁজির জালে তেমন পুঁজিতন্ত্রী রাজনৈতিক কাঠামোতে। কার্যত,ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যকার কয়েকটি পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রের দখলীভুক্ত হয় সমগ্র দুনিয়া। এই দখলাভিযানে অসংখ্য যুদ্ধ ও সংঘাত সংঘটিত হয়েছে । পণ্য উৎপাদনে মুক্ত শ্রমিক আবশ্যক হেতু ভূমি দাসত্ব হতে কৃষককে মুক্ত এবং পণ্যের উপযুক্ত বাজার নিশ্চিতকরণে সমগ্র দুনিয়ার স্থানীয়

ও স্বনির্ভর উৎপাদনী ব্যবস্থাকে ভেংগে চুরমার করে উৎপাদন ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করে পুঁজিপতি শ্রেণী সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজিতন্ত্রী ধাঁছে গড়ে নেয়। এই ধাঁছে অতীতের পরজীবী শ্রেণী আধিপত্য হারিয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কেউ কেউ পুঁজিপতি শ্রেণীর আশ্রয়ে-পশ্রয়ে আশ্রিত হয়েও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ ইত্যাদি দ্বারা ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরানোর নানান অপচেষ্টা করে বিফল ও ব্যর্থ হয়েছে ।

কাজেই, বুর্জোয়াদের পণ্যের বিশ্ব বাজারের আবশ্যকতায় বিশ্ব দখলের প্রয়োজনীয় নীতি-উপনিবেশিকতা কার্যকরণে বুর্জোয়া শ্রেণী যতোই নির্মমতা-নৃশংসতা ও বর্বরতা বা নিষ্ঠুরতা করুক না কেন কার্যত পণ্যের কারণেই ইতিহাসের অবচেতন হাতিয়ার হিসাবে ক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের বিপ্লবী তৎপরতায় অন্ধকার মধ্যযুগীয় অসভ্যতা-বর্বরতা হতে মানবজাতি সভ্যতার আলোকের সন্ধান লাভ করেছে। যারই প্রতিফলে আজকের যুগের তাবৎ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। তাই, শোষক-নিষ্ঠুর ও নির্যাতনকারী হলেও বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিহাসের মানদন্ডে জন্ম ও বিকাশকালে- বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে। তবে, পণ্য অর্থনীতির কারণে- পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেমন হয়ে পড়ে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার অধীন তেমন প্রতিটি জাতিও আন্ত:নির্ভরতার সম্পর্কে সম্পর্কাধীন হয়ে সকল জাতিগত আভিজাত্য ও জাতিগত পরিচয় ক্রমাগত হারাচ্ছে তেমনি শ্রম শক্তির বিক্রেতা মাত্রই কেবলই শ্রম শক্তি বিক্রির মাধ্যমে জীবন-ধারণে বাধ্য হয়ে কেবলই " শ্রমিক" পরিচয় ও চরিত্র লাভ করার কারণে তারা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী -হারিয়েছে যেমন তাদের জাতিগত পরিচয় তেমন দেশ। তাই, পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর যেমন জাত-জাতি নাই তেমন নাই তাদের দেশ। কাজেই, প্রয়োজনে দেশ প্রেম ইত্যাকার ভুয়া ভাবাবেগের বেপারী পুঁজিপতি শ্রেণীই দখল-বেদখল সহ নানান কাঠামো দ্বারা দেশ-রাষ্ট্রের সীমানা যেমন গুড়িয়ে দিয়েছে তেমন জাত-জাতির পরিচয়ের বিনাশ সাধন করে আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বজনীনতার উদ্ভব-উন্মেষ ও বিকাশ সাধনে ভিত্তি তৈরী ও পোক্ত করছে। এটি পুঁজিতন্ত্রী সমাজের আন্ত:বৈরীতা-সংকট ও সমস্যা এবং স্ববিরোধীতা।

(৬) পুঁজিপতি মাত্রই পণ্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেই নিজ নিজ পুঁজি রক্ষা ও পুঁজির পরিমাণ প্রসারিত করতে পারে। অর্থাৎ কেবলমাত্র পণ্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়। ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে না পারলে পুঁজিপতি নিজেই শ্রমিকে পরিণত হতে বাধ্য। তাই পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষায় পুঁজিপতি মাত্রই পণ্য বিক্রেতা হিসাবে অপরাপর পুঁজিপতির প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হয়। অত:পর, প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে নিজ নিজ পণ্য বিক্রির জন্য প্রত্যেক পুঁজিপতিই উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বাজারজাতকরণে একদিকে যেমন অধিকতর উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে বাধ্য হয়, তেমন পণ্য পরিবহন ও পুঁজির সঞ্চালন ব্যয় কমানো সহ পুঁজির দ্রুততর সময়ে পুন:বিনিয়োগে উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা করার জন্যই বাস্পীয় ইঞ্জিন , বৈদ্যুৎতিক শক্তি, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিস্কার, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সাধন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে বাধ্য হয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উৎপাদনী হাতিয়ার তৈরী করে ততোধিক

দ্রুততম সময়ে নতুন নুতন হাতিয়ারাদিকে পুরাতন ও ব্যবহারে অযোগ্য করার মাধ্যমে কার্যত অবিরত উৎপাদনী শক্তির যেমন রূপান্তর সাধন করে উৎপাদন হাতিয়ারাদির বিরামহীন বৈপ্লবীকরণ করে তেমন সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রতিনিয়ত ভাংগা-গড়া চালিয়ে সমাজে সৃষ্টি করে স্থায়ী বিশৃংখলা এবং চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও আতংক। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে স্থায়ী অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তাপূর্ণ সমাজ। সুতরাং, নিশ্চয়তার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণী যে পুঁজি হাসিল করতে চায় সেই পুঁজিই নিজ গুণেই অস্থায়ীত্ব ও অনিশ্চিততার জন্ম দেয় বলেই এমনকি নিশ্চয়তা প্রশ্নেও পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যকার স্ববৈরীতা ও স্ববিরোধীতার সমাজ হচ্ছে -পুঁজিতন্ত্র।

(৭) প্রতিটি পণ্যই অপরাপর পণ্যের সহিত বিনিময় শর্তে আবদ্ধ। তাই প্রতিটি পণ্যই নিজ নিজ উৎপন্ন ব্যয়ে বিনিময় হয় । অর্থাৎ যে কোন পণ্য উৎপন্নে তাতে যে পরিমাণ সামাজিক শ্রম সংযোজিত বা নিষিক্ত হয়, সেই পরিমাণ সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন অপরাপর পণ্যের সমতুল্যে তা বিনিময় হয়। যেমন ১ গজ কাপড় উৎপন্নে গড়ে ১ ঘন্টার সামাজিক শ্রম ব্যয় হয়েছে। অত:পর, ১ ঘন্টার সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন অপর যে কোনো পণ্যের সাথে এই ১ গজ কাপড়ের বিনিময় হবে। অর্থাৎ ১ গজ কাপড়ের সহিত ৩ কেজি চাউল, ১০ কেজি লবন, ২০০ গ্রাম মাছ বা অনুরূপ যে কোন পণ্য বিনিময়যোগ্য ও বিনিময় হয়। তাই পণ্য বিনিময় প্রক্রিয়া হচ্ছে কার্যত গড় সামাজিক শ্রমের সহিত সম পরিমাণ গড় সামাজিক শ্রমের আদান-প্রদান। বৈষম্য-বৈরীতার ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্র- নিজেই পণ্য উৎপাদনী ও বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুগপৎভাবে ও স্ববিরোধীভাবে সামাজিক সমতার তথা শ্রম প্রয়োগকারীদের মধ্যে গড় সমতা বা সাম্যের ভিত ও বোধ তৈরী ও পোক্ত করে নিজেরই অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে ও বিপক্ষে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ চির বৈষম্য-বৈরীতা ও অনৈক্যের পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজের শ্রেণী চরিত্রের বিপরীত চরিত্র অর্থাৎ বৈষম্যহীন, বৈরীতা মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম দিয়ে নিজের কবর রচনাকারী শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতিনিয়ত পুষ্ঠু ও বিকশিত করছে । কাজেই, ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ধ্বংস ও পতনের মাধ্যমে সাধারণ মালিকানার সাম্যতন্ত্রী সমাজের ভিত্তি তৈরী করছে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণী স্বয়ং। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ পুঁজির জন্ম শর্তেই যেমন পচনশীল-মরণশীল তেমন পুঁজিপতি শ্রেণী সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতিবাচক শক্তি। এটিও পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ভয়ানক সংকট-সমস্যা ও স্ববিরোধীতা।

(৮) গিল্ড, হতে ক্রমান্বয়ে কারাখানা ও বৃহদায়তন শিল্পে উন্নীত হওয়ার ধারাবাহিকতায় উৎপাদনী ব্যবস্থায় ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধিতভাবে সৃষ্টি হয়েছে শ্রম বিভাজন। এই বিভাজনের রূপ এতোটাই বিস্তৃতি লাভ করে যে, খোদ শিল্পপতিও জানে না যে, প্রস্তুতকৃত পণ্যের কাঁচামাল সহ অপরাপর বিষয়াদি দুনিয়ার কোন কোন স্থানে উৎপন্ন হয়েছে বা কারা উৎপন্ন করছে। একটি বিশেষ শিল্পেও বহুধা ভাগ-বিভাগে বিভক্ত শ্রমিকেরাও কেবলই নিজ নিজ বিভাগ/শাখার নিজ নিজ ক্রিয়াদি সম্পাদন করে বলে কেউই দাবী করতে পারে না যে, কোনো একটি উৎপন্ন একান্তই তার নিজস্ব উৎপন্নকৃত পণ্য। আবার প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক উন্নতি ও উন্নয়নের মাত্রা ও গতি যেহেতু প্রতিনিয়ত বিরতিহীনভাবে বৃদ্ধি ও তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে সেহেতু নব উদ্ভাবিত নতুন নতুন

যন্ত্র ও প্রযুক্তির বদৌলতে পণ্য উৎপাদনের হার ও মাত্রাও দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। আবার পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় করার জন্য নিযুক্ত হিসাবকর্মী সহ পরিবহণ শ্রমিকও পণ্য অর্থনীতির আবশ্যকীয় অংশ। তাই প্রতিটি পণ্যই উৎপাদিত হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে বহুজনের সমন্বয়ে। অর্থাৎ মোট সামাজিক শ্রমে উৎপাদিত হয় পণ্য। পণ্য উৎপন্নের এই সামাজিক ক্রিয়ায় অংশীদার কারোই বিশেষ বিশেষ গুণ বা গুণাবলীর আবশ্যকতা নাই; বরং উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বল্পতম সময়ে আয়ত্ত করে নিতে সক্ষম যে কোন শাখায় ক্রিয়াদি সম্পন্নকরণের অভিজ্ঞতা। তাই দ্রব্য উৎপাদন তথা সরল অর্থনীতি যুগের ব্যক্তিগত নৈপুন্য ইত্যাদি পণ্য উৎপাদনী অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় নয়। ফলে পণ্য অর্থনীতিই মানুষে মানুষে সমতার ভিত্তি প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করছে। তা ছাড়া ব্যক্তির অংশ গ্রহণে পণ্য উৎপাদিত হলেও পণ্য কেবলই যেহেতু ব্যক্তির ব্যক্তিগত নয় বরং সমাজের মোট সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন হয়। তাই জন্মশর্তে পণ্যের মালিকও যতার্থভাবেই সমগ্র সমাজ না হয়ে কেবলই ব্যক্তি বিশেষ-পণ্য মালিক তথা পুঁজিপতি হওয়াটা সামগ্রীক পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ার সহিত সামঞ্জস্যহীন-বৈরতাপূর্ণ, অযৌক্তিক ও অন্যায় এবং অনাচার ও অন্যায্যতার এক ব্যবস্থা বিশেষ মাত্র। সুতরাং, যুক্তিহীনতা,অন্যায়, অনাচার ও অন্যায্যতার সমাজ হচ্ছে-পুঁজিতন্ত্র ।

(৯) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের সাথে সাথে তা বংশ পরম্পরায় দখল ও ভোগ-ব্যবহারের তাড়নায় উত্তরাধিকারের সুনিশ্চিতিতে পর্যায়ক্রমে এক পতি- এক পত্নি বিবাহ নামক দাসত্বের পারিবারিক প্রথার জন্ম দেয় সম্পত্তিবানরাই। শ্রেণী বিভাজনের এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক জীবন হতে ঘর-কন্যার গৃহস্থালীতে আবদ্ধ -বন্দী তথা সন্তানের গর্ভধারীকে সন্তানের মালিকানা বা অভিভাবকত্ব হতেও বঞ্চিত করে মানুষের জন্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতা প্রসূত ভুল ও ভ্রান্ত বা অসত্য ও বানোয়াটি বক্তব্য তৈরী করে কেবলই পুরুষকেই নবজাতকের প্রত্যক্ষ স্রষ্টা ও মালিক সাব্যস্তে নারীকে কেবলই সন্তান উৎপাদনের কারখানা স্থিরে কেবলই পুরুষের সম্ভোগ ও রমনের নিমত্তে রমনী গণ্যে মানুষ নয় কেবলই সম্পত্তি হিসাবে সাব্যস্তে কেবলমাত্র ভরণ-পোষণের বিনিময়ে স্বামী তথা প্রভূর দাসত্বে জীবনপাতে এমনকি ভারতে "সহ মরণ" এর মতো জঘন্য "সতীদাহ" প্রথার প্রচলন করে সৃষ্ট মধ্যযুগীয় বর্বরতার বৈবাহিক প্রথাকে পুঁজিপতি শ্রেণী বাতিল না করে নানান সংস্কার সাধন করলেও নারীকে কার্যত পুরুষের রমনের সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য করছে। আবার শিল্প-কারখানায় বা পণ্য উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপে নারীকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করে বুর্জোয়া শ্রেণীই নারীকে গৃহবন্দীত্ব হতে মুক্ত করে ক্রমেই পারিবারিক জীবনের বাহিরে বৃহত্তর সামাজিক জীবনে সম্পৃক্ত করেছে।
ফলে - নারী ও পুরুষ একই শিল্পে যেমন শ্রম প্রয়োগ করে তেমন সামগ্রীক পণ্য উৎপাদনী ক্রিয়া-কর্মে অংশ গ্রহণ করে। তবে পুঁজিপতিদের চালাকি-চাতুরালীতে বা নিজেদের সাময়িক অজ্ঞতায় নারী শ্রমিক শুরুতে মজুরী ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হলেও শ্রম শক্তির বিক্রেতা হিসাবে নারী-পুরষ উভয়ে পরিচিত হয়েছে কেবলই মজুরি দাস শ্রমিক হিসাবে। মজুরি দাসত্বের হেতুবাদে প্রত্যেক শ্রমিক কেবলই পণ্য উৎপাদনে মানবিক হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হয়। তাই পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের পণ্য উৎপাদনী ক্ষমতাই

বিবেচ্য। শ্রমের এইরূপ সমমাত্রিকতার জন্য শ্রম শক্তি বিক্রেতার লিংগ পরিচয় ক্রমেই গুরুত্বহীন হচ্ছে ।

উপরন্ত, পুরুষ শ্রমিকের মতোই নারী শ্রমিকও নিজের আয়-রোজাগারে নিজের জীবন-যাপনে যেমন সুযোগ পেয়েছে তেমন শ্রম শক্তি বিক্রির জন্য পুরুষ শ্রমিকের মতোই নারী শ্রমিকও শ্রম বাজারের নিয়মের অধীন এবং যেখানেই শ্রম শক্তির ক্রেতা পাবে সেখানেই তাকে যেতে হবে, শ্রম বিক্রি করতে হবে, থাকতে হবে। তাতে, প্রথাগত বৈবাহিক ও পারিবারিক বন্ধন-সম্পর্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তাই কেবল নয়,বরং পছন্দমতো সংগী নির্বাচন সহ নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বা কেবলই ভালোবাসার টানে মানুষের সাথে মানুষের মিলন বা তদানুরূপ সর্ম্পক গড়ে উঠার সুযোগ-সুবিধা ক্রমবর্ধিতভাবে প্রসারিত হয়েছে বলে প্রথাগত বিবাহের হার যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমন বিবাহের পক্ষ বিশেষ ও ধরণও পাল্টাচ্ছে ।

অত:পর, নারীর প্রতি বৈরী ও আশোভন দৃষ্টিভংগির পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের স্বার্থেই পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থায় নারীকে টেনে এনে পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মধ্যযুগীয় বর্বর, অসভ্য ও ঘৃণ্য জেন্ডার বোধের ক্রমাগত বিনাশ সাধন করছে। অত:পর, দৈহিক কাঠামো ও প্রকৃতিগত কিছু তারতম্য থাকলেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে মানুষ এবং মানুষ হিসাবে কেউ কারো স্বামি তথা প্রভু বা মালিক যেমন হতে পারে না, তেমন কেবলই লিংগজনিত কারণে কেউ কারো ভোগ-সম্ভোগের সামগ্রী বা দাসীও হতে পারে না-পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়া এই বাস্তব ও যৌক্তিকবোধেরও উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জেন্ডারকেন্দ্রীক বৈষম্য-বৈরীতা দুরীকরণের সামুহিক ক্রিয়াদি নিরন্তর করছে-যা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ইতিহাস নির্ধারিত নিয়তি ও পুঁজির জন্ম দোষে দুষ্ট স্ব-বিরোধীতা ।

(১০) পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বিক্রির ব্যবস্থার প্রয়োজনেই পুঁজিপতি শ্রেণীই মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান ঘটিয়ে অজ্ঞতা-মুর্খতার অবসান ঘটাতে কলেজ-বিশ্ব বিশ্বদ্যিালয় সহ প্রতিষ্ঠা করে নানান প্রতিষ্ঠান। পুঁজিপতিরাই সামন্ততন্ত্র তথা রাজতন্ত্রের যেমন উচ্ছেদ করছে, তেমন নতুন রাজনৈতিক ধারা তথা ঈশ্বর নয়, মানুষের তৈরী আইনের শাসনে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জন্ম দিয়েছে রাজনৈতিক দল। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষা, বিকাশ ও প্রসারে উদ্বৃত্ত-মুল্যের অংশ বিশেষ ব্যবহার করে যেমন রাষ্ট্রীয় আনুকুল্যে ও নীতিতে বা নীতিগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ও চর্চা করে রেল-সড়ক, বিমান সহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় ক্রমাগত উন্নতি ও বৈপ্লবীকরণের মাধ্যমে আজকের যুগের নেট-মোবাইল ইত্যাদি উৎপন্ন করেছে, তেমন অব ও পরিকাঠামোগত উন্নতি ও উন্নয়নের মাধমে এবং ঐ প্রক্রিয়ায় হিসাব ও ব্যবস্থাপনা, যন্ত্র, পুর ও কৃৎকৌশল, তড়িৎ ও শক্তি, পদার্থ রসায়ন, জীব ও চিকিৎসা, অর্থ ও সমাজ , গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, পরিবেশ-প্রতিবেশ, পানি-সমুদ্র এবং মহাকাশ ইত্যকার নানান শাখার বিজ্ঞানের জন্ম ও অভূতপুর্ব উন্নতি সাধন করেছে।

উল্লেখ্য- পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থার পুর্বে হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও মানবজাতি এমনকি পৃথিবীর সৃষ্টি, সৌরজগতের উদ্ভব, বিলয় ও বিনাশ বা জীবজগতের জন্ম ও

বিকাশ সম্পর্কেতো নয়ই, এমনকি পৃথিবী যে স্থির নয়, তাও জানতো না কোপর্নিকাসের পূর্বে কেউই, আগুন-পানি ইত্যাদিও ঠিক-ঠাকমতো জানতো না বিজ্ঞানী লিভেয়াজার কর্তৃক অক্সিজেন-হাইড্রোজেন আবিস্কারের আগতক। অত:পর, সৃষ্টি সহ মানুষের জীবন-মৃত্যু সহ দেহগত ক্রিয়াকলাপ বিশেষত হৃদয় ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে যেমন অজ্ঞতা তেমন স্বার্থন্ধতা প্রসুত ভাববাদী দৃষ্টিভংগির বানোয়াটি কল্পকাহিনীর বিপরীতে বস্তুতন্ত্র তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের জন্ম দিয়েছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ।

যে দর্শনের মোদ্দা কথা হচ্ছে- মহা বিশ্ব বস্তুনিচয়ের সমষ্টি। ইতি ও নেতিবাচক শক্তির ঐক্য তথা বৈপরীত্যের ঐক্যই হচ্ছে বস্তু। তাই বস্তুমাত্রই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কাধীন হেতু ক্রিয়াশীল ও গতিশীল এবং রূপান্তর বা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ গঠনমূলেই দ্বন্দ্বমূলক বলেই বস্তুমাত্রই স্বক্রিয়-গতিশীল ও রূপান্তরশীল। অত:পর, দ্বান্দ্বিকতার হেতুবাদে স্বক্রিয় ও গতিশীল বিধায় বস্তুসমূহের গতি, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কারণেই মহা বিশ্বের বস্তুনিচয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একে-অপরের সহিত তথা পরস্পরের সহিত পরস্পর সম্পর্কিত, সমন্বিত ও নির্ভরশীল।ফলে একের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন বা রূপান্তরের সহিত অপরের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে। অর্থাৎ বস্তুর অভ্যান্তরীক দ্বন্দ্ব এবং বাহ্যিক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যে বা রদবদলে বস্তুমাত্রই পরিবর্তনশীল ও রূপান্তরশীল।

সুতরাং, চাপ-তাপের পরিবর্তন হলে বস্তুমাত্রই পরিবর্তিত এবং রূপান্তিরত হয় । এটিই দ্বান্দ্বিক বিধি বা সূত্র। তবে, বস্তুর এইরূপ পরিবর্তন ও রূপান্তর হয় নির্দিষ্ট নিয়মেই অর্থাৎ পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত বস্তু যা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপে-তাপে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়েছে তা পুর্বক্তো বস্তুর পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়ই। যদিচ, রূপান্তর প্রক্রিয়ায় স্বীয় গুণাবলীর তারতম্য ঘটেছে বলেই তা আর পূর্বেরটি নয়, বরং একটি নতুন বস্তু। যেমন- নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপে-তাপে মুরগির ডিম ছানায় রূপান্তির হয় বটে কিন্তু সম পরিমাণ বা একই সাইজের একটি গোল আলু ঐ পরিমাণ চাপে-তাপে মুরগির ছানা নয়, বরং রূপান্তিরত হবে অন্য কোন বস্তুতে। অথবা, যে পরিমাণ চাপে-তাপে পানি বা বরফ রূপান্তরিত হয় বাস্প, পানি বা বরফে সেই পরিমাণ চাপে-তাপে লোহা বা কাঠ -বরফ, পানি বা বাস্পে পরিণত হয় না। এই নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটার সুযোগ নাই । অথবা, কোনো নিয়ম-নীতির ব্যাত্যয় ঘটলে কাংখিত বা প্রত্যাশিত ফললাভ নয়, বরং ঘটে যা তা দুর্ঘটনা এবং এটাই নিয়ম। তাই, বস্তুনিচয়ের সমষ্টি জগত বস্তুতান্ত্রিক নিয়ম-সূত্রের অধীন হেতু অলৌকিক নয় , বরং জগত মানেই বস্তুতান্ত্রিক। তাই জগতে সকল বস্তুই বস্তুতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি ও সুত্রের অধীন।

সুতরাং, কোনো ভৌতিক বা অলৌকিক শক্তি বা তদানুরূপ কোনো কর্তৃত্ব বিশেষ জগতকে যেমন সৃষ্টি করেনি, তেমন নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করে না। তাই, বস্তুগত জগতের জাগতিক নিয়মে যেমন ধরিত্রীর সৃষ্টি হয়েছে তেমন ধরিত্রীতে উদ্ভব ঘটেছে প্রাণ ও প্রাণীর। সুতরাং, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের জন্য যেমন প্রাণীর আবশ্যক হয়নি, তেমন চন্দ্র-সূর্য বা পৃথিবীর সৃষ্টির জন্যও কোনো ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়নি। মহা বিশ্ব সৃষ্টির ৯.১৬ বিলিয়ন বছর পরে সৌরজগত সৃষ্টি হয়েছে যেমন তেমন লয়প্রাপ্ত হবে বস্তুতান্ত্রিক নিয়মেই। এটিও নিয়ম বটে প্রকৃতির। তাই প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে নিয়মহীনতার বা অলৌকিকতার সুযোগ-অবকাশ নাই। সুতরাং, সৌরজগতও নিয়মের অধীন বলেই

প্রাকৃতিক নিয়মেই এটি ধ্বংস বা বিলুপ্ত হবে। আবার একই নিয়মে মহা বিশ্বে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন নক্ষত্র । কাজেই, সৃষ্টি ও লয় দু'ই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হেতু প্রকৃতি হতে সৃষ্ট বা উদ্ভুত প্রাণ ও প্রাণীর জীবনচক্র তথা সৃষ্টি-বিকাশ ও লয় প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে বিধায় প্রাণী হিসাবে ব্যক্তি মানুষেরও জন্ম-মৃত্যু ইত্যকার বিষয় সবই বস্তুতান্ত্রিক নিয়ম-সূত্রের অধীন। আর এরূপ নিয়ম-নীতি বা সূত্রের আওতামুক্ত নয় মানবজাতি তথা মানুষের সমাজ।

তাইতো প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই নিয়মের অধীন বিধায় মানবজাতির সমাজও সুনির্দিষ্ট কারণে ইতোমধ্যে কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। এবং একই নিয়মে অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কের সহিত উৎপাদন শক্তি বা উপায়ের বিরোধ-বৈরীতায় অতীতের মতোই একই নিয়মে বর্তমান পণ্য উৎপাদনী- ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতান্ত্রিক সমাজও স্বীয় সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন উৎপাদনী শক্তির অনিবার্য বিরোধ-বৈরীতায় তথা উৎপাদনী উপায়ের বিদ্রোহে-সামাজিক মালিকানার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিকল্পহীনভাবে ও অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হবে। এটিও সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত ল' তথা নিয়ম-সূত্র বটে। তাই, ধনী হওয়া বা না হওয়া বা শ্রম শক্তির বিক্রেতা হওয়া বা তা না হয়ে শ্রম শক্তির ক্রেতা হওয়া, বা সুস্বাস্থ্য সমেত চিন্তা করার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া বা না পাওয়া, বা অনুকুল সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে কথিত চিন্তাশীল বা বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি তথাকথিত মহাগুণধর ব্যক্তি বিশেষ হতে না পারা, বা ব্যক্তি বিশেষের ভালো-মন্দ বা ক্ষতি-বৃদ্ধি হওয়া, বা না হওয়া বা রোগ-ব্যাধি ইত্যাদিতে চিকিৎসা বা সুচিকিৎসা পাওয়া বা না পাওয়া বা ব্যক্তি হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তির দীর্ঘকালীন বেঁচে থাকা বা না থাকা,ইত্যকার সকল বিষয়ই সামাজিক নিয়মের অধীন এবং এসবই তথা মানুষের জীবনের যা যা ঘটে তা'র সব কিছুই ঘটে থাকে বটে সামাজিক নিয়মে।

সুতরাং, মহাবিশ্বের সকল তারা বা নক্ষত্র,গ্রহ-উপগ্রহ এবং তৎজাত বা তদ্ভুত সকল বস্তু এবং বস্তুজাত প্রাণ ও প্রাণী সকল কিছুই বস্তুতান্ত্রিক নিয়ম-সূত্রের অধীন। অবশ্য, অনুরূপ নিয়ম-সূত্র কোনো মানুষ জানুক বা না জানুক তাতে প্রকৃতির তথা বস্তুতান্ত্রিক নিয়মের হের-ফের হয় না। তাই, মানুষের ইতিহাসের স্রষ্টা স্বয়ং মানুষ হলেও মানুষ কেবলই নিজ বা স্ব-ইচ্ছায় ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে না, বরং ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে মানুষ ঐতিহাসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। সেজন্যই, ব্যক্তি বিশেষ বা নেতা-গুরু, বা মহাত্মা জাতীয় কোনো মহান আত্মার মহান প্রতিভাবান মহান ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ প্রতিভা, মেধা-ক্ষমতা বা যোগ্যতায় নয়, বা কথিত ক্ষণজন্মা ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা দ্বারাও নয় বরং সমাজ পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয় বটে সমাজের সামাজিক নিয়মে, এবং সমাজের সকল মানুষই অধীন বটে অনুরূপ সামাজিক নিয়ম-সূত্রের।

তবে, ইতিহাসে বাঁকে বাঁকে কেউ কেউ হাঁটে বলে বা কোন বিশেষ ঘটনায় কেউ কেউ নিজেকে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত করার সুযোগ পেয়েছে বলে ঐ বিশেষ ঘটনায় বা ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষে বা ইতিহাসের বাঁকের মোড় ঘোরানোর পর্বে সমুপস্থিত ব্যক্তি বিশেষ হয়তো ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার স্রষ্টা বলে মনে হতে পারে আপাত বাহ্যিক দৃষ্টিতে। কিন্তু না, মোটেই তা সত্য নয়, যথার্থ নয়, বরং ইতিহাসের নিয়মে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে থাকার সুযোগ পেয়েছে বলেই ঐ রকম ব্যক্তি বিশেষ ঐ নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনায় বা

সমসাময়িককালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে বটে। কিন্তু, তাই বলে এক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা মেধা বা প্রতিভা বা গুরুগীরি বা পান্ডিত্য নয়, বরং ইতিহাসের নিয়ম-নীতি ও সূত্রই নিয়মক, এবং অনুরূপ নিয়ম-নীতির অধীন বটে খোদ ঐ ব্যক্তিটিও যিনি লাভ করেছে ইতিহাসের অনুকুল সুযোগ। কিন্তু, ইতিহাসের অমন নিয়ম-সূত্রকে তোয়াক্কা না করে বা অস্বীকার করে বা ঐতিহাসিক কালপর্বের বিষয়াদিকে সামগ্রীকভাবে বিবেচনায় না নিয়ে মানবজাতির কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে যখনই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বা ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা,সাহস, যোগ্যতা ও ক্ষমতা ইত্যকার সাধারণ বিষয়াদিকে অসাধারণভাবে ও অস্বাভাবিকভাবে নিয়ামক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তখন যেমন ইতিহাস বিকৃত ও অস্বীকৃত হয়, তেমন ঐ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিও ইতিহাসের আস্তকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, ইতিহাসের নিয়ম-নীতিতেই। কারণ ঐ বিশেষ ব্যক্তিটিওতো আর দশজন মানুষের মতোই মানুষ, এবং কার্যতই বা প্রকৃতই মানুষের বাঁচা-মরার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মানুষ হিসাবে সমসাময়িকালের সীমাবদ্ধতায় যেমন সীমিত তেমন সেই সময়কার সামাজিক-মানবিক বা অমানবিক গুণাবলী সম্পন্ন ।

অথচ, ইতিহাস অস্বীকৃত বোধ-বিবেচনা দ্বারা তাড়িত ও পরিচালিত হয়ে যেমন ঐ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ নিজেকেই ইতিহাসের স্রষ্টা হিসাবে বিবেচনা করে নিজেকে সমাজের আর সকলের চেয়ে বেশী ক্ষমতা-যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে স্থির ও সাব্যস্ত করে সেমতে আচার-আচরণ ও ব্যবহার করতে থাকে তখন খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত কারণেই অপরাপর মানুষের উর্ধ্বে আসীন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিটি কার্যত অপরাপর সকলকে নিজের হুকুমাধীন বা কব্জায় রাখার নিমিত্তে যাবতীয় দমন-পীড়নের ঘৃণ্য পন্থাদি অনুসরণ করায় কার্যত অনুরূপ ব্যক্তি বিশেষ অপরাপর মানুষের ভয়-ভীতি ও ঘৃণার কারণ হওয়া সহ স্বৈচ্চাচারী-স্বৈরতন্ত্রী হয়ে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় মানুষ কর্তৃকই অর্থাৎ সামাজিক নিয়মেই ভূত হয়ে ইতিহাসে ঠাঁই নেয়।

প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজে অমন স্বেচ্চাচারী ভূতদের তথা সামন্ত প্রভু রাজ-রাজড়াদের আধিপত্য ও আধিক্য দীর্ঘকালব্যাপী বজায় রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সাধারণত সেরকম কিম্ভূতকিমাকার অতিমাত্রায় ক্ষমতাধর ব্যক্তি বিশেষ হওয়ার সুযোগ যেমন কম তেমন ঐ ভূতদের রাজত্বও ইতিহাসের নিয়মেই ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় । কাজেই, ইতিহাস জানুক বা না-জানুক বা না মানুক ব্যক্তি বিশেষ কেউ ইতিহাসের নিয়ম-নীতি , তাতে ইতিহাসের কিছু আসে-যায় না, বরং ইতিহাসের নিয়মেই মানুষ ইতিহাস বিনির্মাণ করে এবং ব্যাত্যয়হীনভাবে করবে তা ভবিষ্যতেও মানুষই এবং তা নির্মিত হবে মোটেই নয় বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা-যোগ্যতার বিশেষ বিশেষ মেধা-প্রতিভার ভূত বা নেতা-গুরু বা মহাপন্ডিত ইত্যকার ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা।

উল্লেখ্য- ইতিহাসের বাঁক ঘুরার সময় বা কোনো বিশেষ সময়ের কোনো বিশেষ ঘটনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও কার্যত কোনো ঘটনাই যেমন গুরুত্বহীন নয়, তেমন কোনো ঘটনা বিশেষই অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা হঠাৎ বা আকস্মিক ঘটনা বিশেষও কেবলই হঠাৎ বা আকস্মিক সংঘটিত কোনো ঘটনা বিশেষ আদৌ নয়, বরং ঐ সকল বিশেষ বিশেষ বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ঘটনাবলী বা ঘটনা প্রবাহ

বা হঠাৎ বা আকস্মিক ঘটে যাওয়া ঘটনা বা ঘটনা বিশেষও পূর্বের ঘটনা প্রবাহ বা স্বাভাবিক ঘটনাবলরি বা সাধারণ ঘটনাবলীর চূড়ান্ত রূপ বা একটা বিশেষ পর্যায়মাত্র।
যেমন, ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় পানি বাস্পে রূপান্তরিত হয় বটে তাই এটি কোনো তাৎক্ষণিক বা আকস্মিক বিষয় নয়, অথবা, মুরগির হোক বা মেশিনের চাপ-তাপ হোক ডিম হতে যে মুহূর্তে ছানাটি বেরলো সেটি আপতদৃষ্টে হঠাৎ বা তাৎক্ষণিক মনে হলেও কার্যত তা নয় বরং একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া তাপ-চাপেরই স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে পানি'র বাস্পে রূপান্তর বা ডিমের মুরগির ছানায় জন্মলাভ। সমাজের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের সহিত সমাজের অভ্যান্তরে জন্ম নেওয়া বৈরী ও বিরোধী উৎপাদন উপায় বা শক্তির বিরোধ-বৈরীতা সদা বিদ্যমান বিধায় অধিপতি শ্রেণীর সহিত অধিত শ্রেণীর সংঘাত-সংগ্রাম তথা শ্রেণী সংগ্রাম শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিরতিহীনভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু, আদি সাম্যতন্ত্রী সমাজ বিলুপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছরের বেশী হলেও এযাবৎ মাত্র সমাজ পরিবর্তন হয়েছে দু'বার । অর্থাৎ দাস সমাজ সামন্ত সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে আর সামন্ত সমাজ পুঁজিতন্ত্রে। তাপের দীর্ঘপ্রক্রিয়ায় পানির বাস্প হওয়া যেমনটা আকস্মিক তেমন মৌলিক রূপান্তর। ঠিক সমাজের ক্ষেত্রেও বিরতিহীনভাবে চলমান শ্রেণী সংঘাত-শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে সমাজেরও মৌলিক তথা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কাজেই সমাজ বিপ্লবটা হঠাৎ বা আকস্মিক বা অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশেষ মনে হলেও কার্যত তা হচ্ছে সমাজের দীর্ঘদিনের চলমান স্বাভাবিক শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্তরূপ, যাতে সমাজ বিশেষ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয় নতুন এক সমাজ হিসাবে।
কাজেই কোনো বিশেষ ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ গুণাবলীতে বা পরিকল্পনা মাফিক কার্যতই সমাজ রূপান্তর বা পরিবর্তনের সুযোগ নাই। বরং স্বাভাবিক শ্রেণী সংগ্রামের স্বাভাবিক ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত অবস্থায় বা রূপান্তরের চরম লগ্নে পরিবর্তনের পক্ষে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষ অবস্থান নেওয়ার সুযোগ পায় বা পাবে সেই ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতায় নয়, বরং উল্লেখিতরূপ সুযোগ প্রাপ্তির ব্যক্তি বিশেষও বিশেষ কাল পর্বের হেতুবাদে তথা সামাজিক নিয়মেই তৈরী অর্থাৎ সমাজেরই সৃষ্ট।
সুতরাং, মানবকুলে জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি বিশেষই তা তিনি হোন রাজা-বাদশা, বা সম্রাট বা গুরু-মহাগুরু বা মহাপন্ডিত বা মহাত্মণ বা নেতা-মহানেতা তাতে কিন্তু তিনি কেবলই ইতিহাসের সুযোগ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, বরং সর্বাংশে সত্য হচ্ছে তিনি বা ঐ রকম ব্যক্তি বিশেষ প্রকৃতই এবং স্বভাবতই কেবলই মানুষ এবং মানুষ। যদিচ, তারা তাদের পরজীবীতার স্বার্থান্ধতায় নিজেদেরকে অসাধারণ বা অস্বাভাবিক ব্যক্তিই কেবল নয়, বরং চিত্রিত ও গণ্য করে অলৌলিকক ক্ষমতার অতি প্রাকৃত বিশেষ বলে। তাতে তারা কেউ কেউ হয়েছেন ঈশ্বরপুত্র বা ঈশ্বরের নাতি-পুতি।
কিন্তু, ইতিহাসের পরিহাস- হাফ গড আলেকজান্ডার " দি গ্রেট" সহ এমনতরো কেউ যে তা নয় তাতো প্রমাণিত হয়েছে সাধারণ দুষিত পানিতে পেট পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতোই কথিত গ্রেট আলেকজান্ডারের অকালে মৃত্যুবরণ করা সহ তাবৎ বীর-রাজাকুলের রাজত্ব -কর্তৃত্ব সামুহিকভাবে পুঁজিতন্ত্রের নিকট পরাজয় বরণ করার মাধ্যমে। যদিচ, পুঁজিতন্ত্রে পানিকে যেমন দুষণমুক্ত করা যায়, তেমন দুষিত পানিবাহিত রোগে

আক্রান্ত হলেও উপযুক্ত চিকিৎসায় বেঁচে যায় বটে একদম সাধারণ খেটে খাওয়া হত-দরিদ্র মানুষও। এটিও কালের কালিক সুযোগ-সুবিধা বটে। কাজেই, ঐ কালের গ্রেটরাও একালের অতীব সাধারণ মানুষের তুলনায় অতিমাত্রায় সাধারণ বা কম গ্রেট নয় কি? অথবা, মোগল দরবারের এক তানসেন নয় বরং তানসেন অধিক যোগ্যতা-গুণ সম্পন্ন বহু গায়ক-শিল্পীর একক বা যৌথ গীত-সংগীত কেবল এক বা একাদিক তানপুরা নয় বরং বহ ধরণের বহু বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে নানান বর্ণিল আলোর আলো-আঁধারীর রহস্য ঘেরা রংগীন মঞ্চে পরিবেশিত গান কি শুনছেনা একালের বস্তীবাসী ব্যক্তিটিও? অথবা, বাস্প-বিদ্যুৎ ইত্যকার শক্তির যুগে তাপ-বাতি বা যোগাযোগের বাহন ইত্যকার বিষয়ে অতীতকালের যেকোন রাজা-বাদশার তুলনায় একালের একজন শ্রমিকও কি অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভ করে না? অত:পর, রাজপ্রাসাদের রাজা-বাদশা প্রমুখরা গ্রেট না কি কালিক সুযোগ-সুবিধায় তথাকথিত গ্রেট গ্রেটার ও গ্রেটেস্টের অধিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে বটে একালের তথা পুঁজিতন্ত্রের নিম্নস্তরে অবস্থিত ননগ্রেট ব্যক্তিবিশেষও। কাজেই রাজাই হোক আর শ্রমিকই হোক সকলেই সমসাময়িককালের সুযোগ-সুবিধার সুবিধা ও অসুবিধার অধীন।

জগত ও জীবনকে এমন নীতি-সুত্রের নিয়মে দেখা-বুঝার দৃষ্টিভংগি যা'র উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে খুবই যুক্তিসংগত ও ঐতিহাসিক নিয়মেই পুঁজিতান্ত্রিক যুগে, সেই দর্শন বা দৃষ্টিভংগিতে জীবন ও জাগতিক বিষয়াদি দেখা-বুঝার নিয়ম-নীতি ব্যক্তি বিশেষ কেউ জানুক বা না জানুক বা বুঝক বা না বুঝক তাতে কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুতন্ত্রের যেমন কিছুই যায়-আসেনা, তেমন সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি'র হের-ফের হয় না। তবে, পুঁজিতন্ত্র এই বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের আবিস্কার-বিকাশ সাধন করে দ্বান্দ্বিকভাবে বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজ তারই সৃষ্ট ও পুঁজি উৎপন্নে অপরিহার্য শ্রমিক শ্রেণীকে জীবন ও জগত বা জাগতিক বিষয়াদিকে বস্তুতান্ত্রিকভাবে দেখার তথা পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের ব্যক্তিমালিকানা সম্পর্কিত ন্যায়-অন্যায় ও ন্যায্যতা- অন্যায্যতা ইত্যকার বিষয়াদি উপলব্দিতে উপযুক্ত সুযোগ তৈরী করেছে।

বস্তুতান্ত্রিক নিয়ম-সূত্র তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুতন্ত্রী দর্শন নিজেই যেমন একটি বৈশ্বিক বিষয়, তেমন খন্ডিত বা আংশিকভাবে জীবন-জগত বা পণ্য উৎপাদন বা পুঁজির মালিকানা ইত্যকার বৈষয়িক ও জাগতিক বিষয়াদিকেও যে খন্ডিত বা আংশিকভাবে দেখার সুযোগ নাই তাও নিশ্চিত করে বটে বস্তুতান্ত্রিক দর্শন। একক যেমন সমষ্টির অংশ তেমন সামগ্রীতাকে বিবেচনায় না নিয়ে কেবলই একক বা একক ব্যক্তি বা সত্ত্বা বিশেষের উপর গুরুত্বারোপ সত্যের অপলাপমাত্র। যেমন সমাজিক শ্রমে পুঁজি উৎপন্ন হলেও উদ্যোক্তা ব্যক্তির ভূমিকাকে পণ্য উৎপন্নে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের দেয় বক্তব্য বা মতামতও কেবলই অর্ধসত্য যা মিথ্যার নামান্তর। সুতরাং, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগির অধিকারী ব্যক্তিমাত্রই বৈশ্বিক দৃষ্টি ভংগিসম্পন্ন না হয়ে খন্ডিত বা আংশিক দৃষ্টিভংগি সম্পন্ন হওয়ার সুযোগ নাই। এককথায় জগত ও জীবনকে খোলা-খোলি দেখা তথা প্রকৃতির সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কে মুক্তভাবে দেখার দৃষ্টিভংগিই হচ্ছে- দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক দর্শন।

অত:পর, ব্যক্তি বিশেষের মাহাত্মে সৃজিত অতীতের সকল শ্রদ্ধা বা ভাবাবেগের বা তথাকথিত লাজ-লজ্জার বা গোপনীয়তার ভ্রান্ত-ভুয়া দৃষ্টিভংগিকে যেমন পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়া ক্রমাগতভাবে নি:শেষ করছে তেমন বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়ে জগত ও জীবনকে খোলাখোলি বা মুক্তভাবে দেখা-বুঝার সুযোগ সৃষ্টি করে খোদ পুঁজিতন্ত্র স্বয়ং তার নিজের গোপন রহস্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য আবিস্কার ও তা বুঝতে উপযুক্ত ভিত্তিও বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক ভিত্তির মতোই নিজেই তৈরী করে পুঁজিতন্ত্র নিজেই নিজের ধ্বংসের উপযুক্ত কারণ ও কারক উন্মোচিত ও উন্মেলিত করেছে। এটিও পুঁজিতন্ত্রের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া এবং স্ববিরোধীতাও।

(১১) পণ্য বিনিময়ের সুবিধার্থেই আধুনিক মুদ্রা সহ পর্যায়ক্রমে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব-বিকাশ তথা ক্রেডিক ও ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে পুঁজিপতি শ্রেণী। পুঁজি- শেয়ার বাজার বা ষ্টক মার্কেটে উত্তীর্ণ হয়ে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়ে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের পচনশীলতার স্তরে ব্যক্তিগত মালিকানার বিপরীতে সামাজিক মালিকানার প্রত্যক্ষ ভিত্তি তৈরী করেছে খোদ পুঁজিতন্ত্র। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণার জন্য কার্ল মার্কসের দ্বারাস্ত হওয়াই শ্রেয়।

বাণী প্রকাশ, কলকাতা, ভারত হতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০৯, মার্কসের " ক্যাপিটাল" এর "পঞ্চম খন্ড-সাতাশ অধ্যায়: ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে ক্রেডিটের ভূমিকা" পৃষ্ঠা-৪২৮ এ বর্ণিত এই :

"৩. স্টক কোম্পানি গঠন : তার ফলে :

(১) উৎপাদনের আয়তনের ও উদ্যোগ সমূহের বিপুল সম্প্রসারণ, যা আগে ছিল ভিন্ন ভিন্ন একক মূলধনের পক্ষে অসম্ভব। একই সময়ে যে উদ্যোগগুলি আগে ছিল সরকারী উদ্যোগ , সেগুলি পাবলিক।

(২) যে মূলধন নিজে নির্ভর করে উৎপাদনের একটি সামাজিক পদ্ধতির উপরে এবং ধরে নেয় উৎপাদনের উপায় এবং শ্রমের সংকেন্দ্রীভবনের আগে থেকেই উপস্থিতি, তা এখানে প্রত্যক্ষভাবেই হয় সামাজিক মূলধনের (প্রত্যক্ষভাবেই সম্মিলিত ব্যক্তিদের মূলধনের) রূপের দ্বারা মন্ডিত- ব্যক্তিগণ মূলধন থেকে যা পৃথক, এবং তার উদ্যোগগুলি ধারণ করে সামাজিক উদ্যোগের রূপ-ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে যা পৃথক। এটা হল খোদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামোর মধ্যেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে মূলধনের অবসান।

(৩) সত্যিকারের কার্যরত ধনিককে অন্য লোকদের মূলধনের নিছক একজন ব্যাবস্থাপকে তথা প্রশাসকে, এবং মূলধনের মালিককে নিছক একজন মালিকে তথা অর্থ-ধনিকে রূপান্ত রিতকরণ। এমন কি যে লভ্যাংশ তারা পায়, তা যদি সুদ এবং উদ্যোগ জনিত মুনাফাও , অর্থাৎ মোট মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত করে (কেননা ব্যাবস্থাপকের বেতন হল, কিংবা হওয়া উচিত, এক বিশেষ ধরণের কুশলী শ্রমের মজুরি যার দাম শ্রমের বাজারে অন্য যে কোনো প্রকারের শ্রমের মতোই নিরুপিত হয়), তাহলেও এই মোট মুনাফা এখন পাওয়া যায় কেবল সুদের রূপে, অর্থাৎ মূলধনের মালিকানা বাবদে কেবল প্রতিপূরণ হিসাবে- যে মূলধনের মালিকানা এখন সত্যিকারের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ঠিক যেমন ব্যবস্থাপকের ব্যক্তি-ভূমিকা এখন মূলধনের মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ

বিচ্ছিন্ন। মুনাফা এইভাবে দেখা দেয় (আর, যাকে সুদ বলা হয়, তার কেবল সেই অংশটি মাত্র নয়, যা তার পক্ষে সমর্থন লাভ করে ধার গ্রহীতার মুনাফা থেকে) অপরের উদ্বৃত্ত, মুল্যের নিছক আত্মীকরণ হিসাবে, যার উদ্ভব ঘটে উৎপাদনের উপায় সমুহের মুলধনের রূপান্তরণ থেকে অর্থাৎ সত্যিকারের উৎপাদনকারীর প্রতিপ্রেক্ষিতে তাদের পরকীকরণ থেকে উৎপাদনের কাজে সত্য সত্যিই নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির- ম্যানেজার থেকে সর্ব শেষ দিন মজুর পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির – প্রেক্ষিত আর একজনের সম্পত্তি হিসাবে তাদের প্রতিস্থিতি (' এন্টিথিসিস') থেকে। স্টক কোম্পানীগুলিতে কাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মুলধনের মালিকানা থেকে, অতএব শ্রমও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উৎপাদনের উপায় উপকরণ এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের মালিকানা থেকে। ধনতান্ত্রিক চূড়ান্ত বিকাশের এই ফলটি হচ্ছে উৎপাদনকারীদের সম্পত্তিতে মুলধনের পুন:রূপান্তর পরিগ্রহের পথে একটি আবশ্যিক অতিক্রান্তিকালীন পর্যায়- যদিও একান্তভাবে একক উৎপাদনকারীদেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নয়, বরং সম্মিলিতভাবে উৎপাদনকারীদের সম্পত্তি হিসাবে। অন্যদিকে স্টক কোম্পানি হল পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে কাজগুলি এখনও ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির সংগে গ্রন্থিবদ্ধ আছে, সেই যাবতীয় কাজের অতিরিক্ত সম্মিলিত উৎপাদনকারীদের কার্যাবলীতে, সামাজিক কার্যাবলীতে।" এবং পৃষ্ঠা নং-৪২০ এ বর্ণিত এই:

" এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অভ্যন্তরেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিলোপ সাধন, এবং অতএব একটি আত্মধ্বংসী স্ববিরোধী, যা স্পষ্টতই নির্দেশ করে উৎপাদনের এক নতুন অতিক্রমণের একটি পর্যায়মাত্র। এইভাবে তা আত্মপ্রকাশ করে তার ফলাফলের মধ্যে একটি স্ববিরোধ হিসাবে। উৎপাদনের কয়েকটি ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করে একচেটিয়া ব্যবস্থা এবং এইভাবে আবশ্যক করে তোলে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। তা পুনরুৎপাদিত করে একটি নতুন আর্থিক অভিজাততন্ত্র, প্রযোজক ফাটকাবাজ এবং নাম সর্বস্ব পরিচালকের আকারে পরগাছাদের এক নতুন গোষ্ঠী যৌথ কোম্পানির প্রযোজনা, শেয়ার ইস্যু এবং শেয়ার নিয়ে ফাটকাবাজির একটা গোটা ঠগবাজি ও প্রতারণামুলক ব্যবস্থা। এটা ব্যক্তিগত উৎপাদন, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ছাড়া।

(৪) স্টক কোম্পানির ব্যবসা ছাড়াও যা প্রতিনিধিত্ব করে খোদ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতেই ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত শিল্পের অবসানের, এবং যতই প্রসার লাভ করে এবং আক্রমণ করে নতুন নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র ততই অবসান ঘটায় ব্যক্তিগত শিল্পের - সেই স্টক কোম্পানির ব্যবস্থা ছাড়াও, ক্রেডিট একক ধনিককে কিংবা , যে-ব্যক্তি ধনিক বলে গণ্য হয়, তাকে দেয় অপরের মুলধন ও সম্পত্তির উপরে এবং তার মাধ্যমে অপরের শ্রমের উপরে, কয়েকটি সীমার মধ্যে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ। তার নিজের ব্যক্তিগত মুলধনের উপরে নয়, সামাজিক মুলধনের উপরে, তার নিয়ন্ত্রণ তাকে দেয় সামাজিক শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ। একজন লোক খোদ যে মুলধনের সত্যি সত্যি মালিক, কিংবা মালিক বলে সাধারণের দ্বারা পরিগণিত, সেই মুলধন বস্তুত হয়ে উঠে ক্রেডিটের উপরিকাঠামোর বনিয়াদ। এটা বিশেষভাবে সত্যি পাইকারী বাজারের ক্ষেত্রে, যার মধ্য দিয়ে সামাজিক উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ যায়। পরিমাপের সমস্ত মান, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনে এখনো উত্থাপিত কম বেশী সমস্ত কৈফিয়ৎ, এখানে অন্তর্হিত হয়। পাইকারী ফাটকা-কারবারী যার ঝুঁকি নেয়,

তা তার নিজের সম্পত্তি নয়, সামাজিক সম্পত্তি। সঞ্চয়ের সংগে মূলধনের উৎপত্তিকে সম্পর্কিত করে যে বক্তব্য, তাও হয়ে ওঠে সমান অখাদ্য, কারণ সে যা দাবী করে তা হল অন্যরা তার জন্য সঞ্চয় করুক। [------] ভোগ-বিরতি সম্পর্কে অন্য কথাটি সরাসরি খারিজ হয়ে যায তার বিলাসের দ্বারা, যা নিজেই এখন ক্রেডিটের একটি উপায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি কম বিকশিত পর্যায়ে যে ধ্যান-ধারণাগুলির কিছু অর্থ থাকে, সেগুলি এখানে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন। সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুইই এখানে পরিণতি লাভ করে মূলধনের কেন্দ্রীভবনে, এবং সবচেয়ে স্বত্ব-হরণে। স্বত্ব হরণ এখানে বিস্তার লাভ করে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী থেকে ক্ষুদ্র মাঝারি ধনিক পর্যন্ত। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের এটা হচ্ছে সূচনা বিন্দু; এই উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে এর সম্পূর্ণতা সাধন। সর্বশেষ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে উৎপাদনের উপায়সমূহের স্বত্ব হরণ। সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের সংগে উৎপাদনের উপায়সমূহ আর ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপায় এবং ব্যক্তিগত উৎপাদনের ফল থাকে না, এবং সেইজন্যে সেগুলি তারপরে হতে পারে কেবল সম্মিলিত উৎপাদনকারীদের হাতে উৎপাদনের উপায়, মানে তাদের সামাজিক সম্পত্তি, ঠিক যেমন সেগুলি তাদের সামাজিক উৎপাদনের ফল। অবশ্য, এই স্বত্ব-হরণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকাশ পায় একটি স্ববিরোধী রূপে, কয়েকজনের দ্বারা সামাজিক সম্পত্তির আত্মাসাৎকরণের রূপ; এবং ক্রেডিট এই আত্মসাৎকারীদের ক্রমেই বেশি বেশি করে দান করে নিছক ভাগ্য- সন্ধানীর স্বরূপ। যেহেতু সম্পত্তি এখানে থাকে স্টকের আকারে, সেইহেতু তার গতিবিধিও হাত বদল হয়ে ওঠে শেয়ার বাজারে (স্টক এক্সচেঞ্জ) নিছক জুয়া খেলার ফল, যেখানে ছোট মাছগুলো খেয়ে ফেলে হাঙরেরা এবং মেষশিশুগুলিকে। শেয়ার বাজারের নেকড়েরা, স্টক কোম্পানিগুলি পুরোনো রূপের প্রতি বিরোধীতা, যেগুলিতে সামাজিক উৎপাদনের উপায়সমূহ প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে; কিন্তু স্টকের রূপে রূপান্তর তখনও থাকে ধনতন্ত্রের জালে জড়ানো; অতএব সামাজিক ধন এবং ব্যক্তিগত ধন হিসাবে ধনের চরিত্রে স্ববিরোধকে অতিক্রম করার পরিবর্তে স্টক কোম্পানিগুলি তাকে বিকশিত করে নতুন রূপে। ”

এবং ৪২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই:

“ ক্রেডিট ব্যবস্থা দেখা দেয় অতি-উৎপাদন এবং বাণিজ্যে অতি ফাটকাবাজির প্রধান পোষক হিসাবে কারণ পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া, যা স্বভাবতই স্থিতিস্থাপক,তাকে এখানে সজোরে প্রসারিত করা হয় তার চরম সীমায়, এবং এটা এভাবে করা হয় কারণ সামাজিক মূলধনের একটা বড়ো অংশই নিয়োজিত হয় তাদের দ্বারা, যারা তার মালিক নয় এবং যারা স্বভাবতই কাজকর্ম চালনা করে মালিকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভাবে, যে নিজে যখন তা চালায় তখন উদ্বেগ ভরে চিন্তা-ভাবনা করে তার ব্যক্তিগত মূলধনের বিবিধ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। এটা সরলভাবে এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের স্ববিরোধী প্রকৃতির উপরে ভিত্তিশীল মূলধনের আত্মপ্রসারণ সত্যিকারের অবাধ বিকাশের সুযোগ দান করে কেবল একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অবধি, যার দরুন বস্তুতপক্ষে তা কাজ করে উৎপাদনের পক্ষে একটি অন্তর্নিহিত শৃংখল ও প্রতিবন্ধক হিসাবে, যা ক্রমাগত ভাঙা হয়, ভেদ করা হয় ক্রেডিট ব্যবস্থার মাধ্যমে। অত্রএব, ক্রেডিট ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করে উৎপাদন শক্তিসমূহের বিকাশ এবং বিশ্ব বাজারের প্রতিষ্ঠা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক

উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির এই বস্তুগত ভিত্তিসমূহকে পূর্ণতা প্রাপ্তির একটা মাত্রা অবধি উত্তীর্ণ করে দেওয়া। একই সময়ে ক্রেডিট ত্বরান্বিত করে এই স্ববিরোধের প্রচেষ্টা বিস্ফোরণসমূহকে- সংকটসমূহকে- এবং এইভাবে পুরোনো উৎপাদন পদ্ধতির ভাংগনের উপাদান-সমূহকে।

ক্রেডিট ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত দুটি বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রেরণাকে যা হচ্ছে অপরের শ্রমের শোষণের মাধ্যমে ধনার্জন তাকে জুয়াড়িবৃত্তি ও জালিয়াতির সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও বিরাট রূপটিতে বিকশিত করা এবং যারা সামাজিক সম্পদ শোষণ করে, তাদের সংখ্যা ক্রমেই আরো আরো হ্রাস করা; অন্যদিকে উৎপাদনের এই নতুন পদ্ধতিতে, অতিক্রমণের রূপটি গড়ে তোলা। "

অর্থাৎ মার্কসের বক্তব্যমতে- ক্রেডিট ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্র নিজেই নিজের ধ্বংসকারী সামাজিক মালিকানার আশু ও সামুহিক অবস্থা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন ও সৃষ্টি করে পুঁজিতন্ত্রের বিলুপ্তিতে সমাজতন্ত্রের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে। এককথায় ক্রেডিট ব্যবস্থাই পুঁজিতন্ত্রের শেষ বা সর্বোচ্চ পর্যায়।

অত:পর, প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্যযোগ্য যে, লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়ল-মাতুব্বররা যে বলেন- মার্কস না কি পুঁজিতন্ত্রের শেষ সীমা দেখেনি। তাই, সৎ ব্যবসায়ী ও দু:স্থ-পীড়ত বুর্জোয়ার বন্ধু-সমর্থক ও সহযোগি জনাব লেনিন যার-পর নাই কষ্ট করে অতি পান্ডিত্যের পরিচয় প্রদর্শন করে ১৯১৬ সালে লিখলেন- " সাম্রাজ্যবাদ- পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়।" পুস্তকটি,যা নাকি লেনিনবাদের মৌলিক আবিস্কার ও ভান্ডার। কিন্তু মার্কসের " পুঁজি" থেকে নেওয়া উপরোক্ত উদ্ধৃতিতো নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে সংকটগ্রস্ত বুর্জোয়ার দালাল লেনিনের এতদ্বিষয়ক দাবী কতটা অসত্য-মিথ্যা ও বানোয়াটি। ফলে তার বইটিও একটি আবর্জনা ব্যতীত কিছুই নয়। অবশ্য, পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট লেনিনদের মতো প্রতারকরা এমন প্রতারণা না করলে-মার্কসদের জন্মের পুর্বেই পচনদশায় উপনীত সংকটাপন্ন পুঁজিতন্ত্র এত্তোদিন টিকতো কি ভাবে ?

(১২) পুনরুৎপাদন ব্যতীত পুঁজি নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম-অযোগ্য। তাই, পুঁজিপতি ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় পুনরুৎপাদনে বাধ্য। সমাজের সামগ্রীক চাহিদা নয়, পুঁজির স্বার্থেই একই নিয়মে প্রত্যেক পুঁজিপতি ক্রিয়াশীল থাকে । এই ক্রিয়াশীলতায় আধুনিক উৎপাদন শক্তির যথার্থ ব্যবহার করে প্রতিযোগিতামুলক বাজারে টিকে থাকতে গিয়ে সামগ্রীকভাবে সকল পুঁজিপতি মোট যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে তা চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত। আবার সমাজের মোট চাহিদা বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ যেমন ব্যক্তি পুঁজিপতির নাই, তেমন বাজারে অব্যাহত দখলী অভিযান চালিয়ে অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বিকে হটিয়ে বা বেদখল দিয়ে পণ্য বিক্রি করতে না পারলে যেমন পুঁজিপতি পণ্য মজুতের সংকটে নিপতিত হয় তেমন বিদ্যমান বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সীমিত পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন করলে পুঁজিপতির বিনিয়োগকৃত পুঁজি দ্বারা ব্যবহৃত উৎপাদন শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করা সম্ভব নয় বলে পুঁজিপতির বিনিয়োগকৃত পুঁজি নিদেন পক্ষে অটুট থাকার সুযোগ নাই। কাজেই, সামাজিক চাহিদা বিবেচনা করা ও সামগ্রীক পরিকল্পনা মতো উৎপাদনী ক্রিয়া চালানো সম্ভব নয় কোনো ব্যক্তি পুঁজিপতির পক্ষে । সুতরাং, পুঁজির

অস্তিত্বের শর্তে প্রত্যেক পুঁজিপতিকে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করতেই হচ্ছে নৈরাজ্যিকভাবে।

ফলে-এরূপ প্রতিযোগিতামূলক নৈরাজ্যিক উৎপাদনের অনিবার্য পরিণতি- চাহিদার তুলনায় মোট উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বেশী হওয়া অর্থাৎ অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন। অবিক্রিত তথা অতিরিক্ত পণ্যের মজুত যতোই বাড়তে থাকে ততোই অতিরিক্ত উৎপাদন সংকটে নিপতিত হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী মন্দা মোকাবেলায় প্রাথমিকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ, ইত্যকার প্রক্রিয়ায় আরো নতুন নতুন সংকটের জন্ম দিয়ে ব্যাংক-বীমা ও শেয়ার মার্কেট ইত্যাদিতেও ধ্বস নামিয়ে একদিকে চাকুরিচ্যুতি ও বেকারত্বের হার বৃদ্ধি করে, অপরদিকে ক্রয় ক্ষমতা হারানো ক্রমবর্ধিত জনসমষ্টি স্বল্পমাত্রার ক্রয়ে বাধ্য হওয়ায় পণ্য বিক্রির সংকট তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে মন্দা-মহামন্দার এক দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে। ১৭৭০ সালে প্রথম মন্দার সৃষ্টি হলেও বিশ্ব বাজারের দখলদার ইংলন্ডের কাপড় কল মালিকেরা প্রথম বড় ধরনের মন্দায় নিপতিত হয় ১৮১৫ সালে। মন্দাক্রান্ত পুঁজিপতি শ্রেণী মন্দা হতে রেহাই পেতে উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করা সহ পরস্পরের বাজার দখল-বেদখলে যুদ্ধ-সংঘাত ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে কেবল পণ্য বা পণ্য উৎপাদনের শিল্প-কারখানাই নয়, ধ্বংস করেছে বটে অবকাঠামো সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং খুন-জখম করেছে বহু কোটি মানুষ।

পুনরুৎপাদন ছাড়া পুঁজি বাঁচে না, আবার পুনরুৎপাদনে অতি উৎপাদনের সংকট ও মন্দা এবং মন্দার ফলে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীর সদস্যদের কারো কারো ব্যক্তিমালিকানা হতে উচ্ছেদ হয়ে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার দেউলিয়াপুর্ণ উভয় সংকটাবস্থায় নিপতিত হয়ে খোদ পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা স্বয়ং ব্যক্তিমালিকানা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠায় বিপদাপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণী মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষায় পর্যায়ক্রমে ট্রান্স ন্যাশনাল কোম্পানি গঠন এবং রাষ্ট্রীয় খাতের পত্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রিয় পুঁজির আবরণে ব্যক্তি পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা-অপচেষ্টা করার অংশ হিসাবে সামগ্রীক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও সীমিতকরণ সহ নানান বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেও পুঁজির ইতিহাস নিদিষ্ট চরিত্র ও জন্মদোষ হেতু মন্দার সংকট হতে রেহাই পায়নি পুঁজিতন্ত্র।

পুন:পুন মন্দার দুষ্টচক্রে নিপতিত বিশেষত অতিরিক্ত পণ্যভারাক্রান্ত জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণী পণ্যভার হতে রেহাই পেতে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইতিহাসের ভয়বহতম হত্যাকান্ড ও ভয়ানক ধ্বংস-যজ্ঞ সংঘটিত করে নিজেরা পরাজিত হলেও সামাজিক পুঁজির কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার একচ্ছত্র বৈশ্বিক কর্তৃত্ব তথা বিজয়ীদের আধিপত্যে বিশ্ব ব্যাংক-বিশ্ব মুদ্রা ভান্ডারের মতো বিশ্ব পুঁজির বৈশ্বিক সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে আপাত:ত সমূহ বিপদ বা ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেছে বিশ্ব দখলদার পুঁজিতন্ত্র।

ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্র জন্মকালে গিল্ডকর্তা বা স্বাধীন কৃষককেও মালিকানাহীনে পরিণত করেছে। কিন্তু অতিরিক্ত উৎপাদনের চাপে ও দায়ে বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্র স্বীয় জন্ম শর্তেই পুন:পুন মন্দায় নিপতিত হয়ে এবার নিজেই নিজের শ্রেণীর অনেককেই মালিকানাহীন অবস্থায় নিক্ষেপ করে শ্রম শক্তি বিক্রেতায় পরিণত করে ব্যক্তি মালিকানা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে কার্যত পুঁজিতন্ত্রের মরণ রাস্তা ক্রমাগত প্রশস্ত করছে এবং এই প্রক্রিয়ায়

পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল। কারণ- পণ্য উৎপাদনের জন্যই নিত্য নতুন হাতিয়ার তৈরী ও উদ্ভাবন এবং সেসবের উন্নয়ন ও উন্নতি সাধনের মাধ্যমে একদিকে সমাজে শ্রম বিভাজন সৃষ্টি করে ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ কৃতিত্ব বা গুণাবলীর পরিবর্তে গড়ে সকলের সাধারণ শ্রম শক্তির সামাজিক ব্যবহারের সমতা সৃষ্টি করে সামগ্রীক উৎপাদনী ব্যবস্থাকে এক সামাজিক ব্যবস্থায় উন্নীত ও পরিণত করেছে বলে পুঁজিতন্ত্রী সমাজে প্রতিটি পণ্যই উৎপন্ন হয় সামাজিকভাবে। অথচ, পণ্যের মালিকানা ব্যক্তিগত বলে এটি স্ববিরোধীতার সংকট ও সমস্যায় আক্রান্ত ও নিমজ্জিত; অন্যদিকে- ক্রম উন্নত উৎপাদীন শক্তি ব্যবহার করলেই অতিরিক্ত উৎপাদনের চাপে পড়ে খোদ উৎপাদনী শক্তির মালিক স্বয়ং পুঁজিপতি- এবং এটিই ব্যক্তিমালিকানার সম্পর্কের বিরুদ্ধে সামাজিক মালিকানার স্বপক্ষে সামাজিক চরিত্রের উৎপাদনী শক্তির বিদ্রোহ তথা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অবসানের সমোপস্থিত হেতুবাদ যদ্বারা উৎপাদনী শক্তি কার্যত নিজের সামাজিক চরিত্র রূপায়নে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সামাজিক শর্ত সৃষ্টি করছে। কাজেই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ নিজেই নিজের ধ্বংসকারী। তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুঁজিতন্ত্র বিলুপ্ত হবে না তাই, কবরপাড়ে উপনীত পুঁজিতন্ত্রী সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় পুঁজিতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করে থাকে সেই সকল প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়া-কান্ডের বিপরীতে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লিবক ক্রিয়া-কান্ড কমিউনিস্ট বিপ্লবের আবশ্যকীয় শর্ত। অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রের নৈরাজ্যপনার সমাধান সাম্যতন্ত্রী পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা বলেই কোনো প্রকার স্ব:তস্ফূর্ততা বা নৈরাজ্যিক ক্রিয়া কলাপের সুযোগ নাই পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ-বিলোপকারী স্বয়ং সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর।

২য় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি সমগ্র দুনিয়ার দখলভার গ্রহণ করে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাকে একটি মাত্র কেন্দ্র হতে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধনের জন্য সকল রাষ্ট্রের সমন্বয়ে কার্যত রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার হানি-ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন করে প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্ব মুদ্রা ভান্ডার। তাতে কেন্দ্রীভূত পুঁজির কেন্দ্রীয় ক্ষমতা যেমন প্রতষ্ঠিত হয়েছে তেমন রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ অক্ষমতা ও অযোগ্যতায় বহুধাভাগে ভাগ-বিভাগ হয়ে ইতিমধ্যে জন্ম দিয়েছে ২শতাধিক তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র; এবং এসকল রাষ্ট্র সহ রাষ্ট্র রক্ষক-সংরক্ষক বিশ্ব ব্যাংক ও তদানুকূলে প্রতিষ্ঠিত আরো আরো বৈশ্বিক সংস্থা ও সংগঠন এবং এ সকল সংস্থা-সংগঠনের পক্ষে বহুমুখীন নানান তৎপরতা চালিয়ে সকল মানুষকে কৃত্রিমভাবে ধনী বানানোর খোয়াব দেখিয়ে কার্যত যতোভাবে সম্ভব শ্রমিক শ্রেণীকে তার শ্রেণী চৈতন্য হতে দুরে রেখে ও শ্রমিক শ্রেণীর শ্রম আরো বেশীদিন অধিকতরমাত্রায় আত্মসাতকরণের দুরভিসন্ধিতে সৃষ্ট অসংখ্য তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগী ও মানবাধিকার সংগঠন ইত্যকার পরগাছা জাতীয় সংগঠনগুলোর যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহার্থে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য করছে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে। ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের হার-মাত্রা বাড়িয়ে বয়োবৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীর দুর্যোগ-দুর্দশা ও দুরাবস্থা অনেক অনেক বেশীমাত্রায় বৃদ্ধি করেছে।

উল্লেখ্য, যুগপৎ প্রাচুর্য ও চরম দারিদ্রের পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পুঁজি গঠিত ও পুঞ্জিভূত হয়, শ্রম শক্তির বিক্রেতা শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য হতে। কাজেই যতোবেশী মাত্রায়

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যতোবেশী পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে মজুরি দাস শ্রমিক ততোবেশী হারে বাড়তে থাকে পুঁজি এবং ততোবেশী পরিমাণ পুঞ্জিভূত হয় পুঁজি। তাই, পুঁজি সৃষ্টি ও পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির শর্ত হচ্ছে শ্রম শক্তির বেচা-কেনা তথা মজুরি দাসত্বের অবস্থা জারী ও বহাল রাখা।

উৎপাদন ব্যয়ের বেশী দামে যেহেতু পণ্য বিক্রি হয় না, সেহেতু শ্রম শক্তির মালিক-মজুরও তার মজুরি বাবত তার পণ্য উৎপাদনের ব্যয়ের অধিক দাম পায় না। আবার যার- পুঁজি হতে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে জীবন ধারণের সুযোগ থাকে সেতো মজুর হতে যায় না। অত:পর, পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষক বিশ্ব ব্যাংক যদি দারিদ্রমুক্ত একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠাকে মুল শ্লোগান হিসাবে তার লালাটে উদ্ধৃত করে এবং সে শ্লোগান কার্যকরণে হাজার হাজার ভুয়া মানব দরদী মহাপন্ডিত বা দরিদ্রের দু:খের ব্যাপারী নোবেল জয়ী দাওবাজ কারবারী প্রমুখরা হাজার হাজার তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা-সংগঠন দুনিয়াময় জন্ম দিয়ে লাখ লাখ লোককে পরজীবিতার ছিটেফোঁটা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে মরুব্বী গোছের চালাক-চতুর ব্যক্তিরা পরের ধনে পোদ্দার বনে নিত্য গরীবমানুষকে কেবল ঋণজালেই আটক-আবদ্ধ করছে না, বরং অনেককেই ঋণ খেলাপির দায়ে কারাগারে নিক্ষেপ বা বাস্তুভিটা হারিয়ে ক্ষুদ্র ঋণের উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করেও কেবলই জাতিগত উন্নয়ন ও উন্নতির ফালতু ওয়াজ-নছিহৎ ও বিদেশী পুঁজির সেবাদাস হয়েও দেশপ্রেমের বুজরুকী জাহির করে যাচ্ছে- তাতে বিশ্ব ব্যাংক ও ব্যাংকের সহযোগি ইত্যকার উন্নয়নপন্থীদের তথাকথিত দরদী ক্রিয়াকলাপে যদি সত্যি সত্যি বিশ্বের সকল মানুষ দারিদ্রমুক্ত তথা ধনী হয়ে যায়,তবে শ্রম শক্তির বিক্রেতা- তথা মজুরি দাস শ্রমিক কোথায় পাওয়া যাবে ?

অথচ, তারাও জানে যে, মজুরি দাস শ্রমিক না হলে পুঁজি সৃষ্টি ও পুঞ্জিভূত হয় না। আর শ্রমিক মানেই কেবল দরিদ্রই নয়, বরং দু:সহ-দুর্বিসহ যন্ত্রণাময় জীবনের শিকার। যদিচ, দরিদ্র মানেই শ্রমিক নয়। অত:পর, কপট-মিথ্যাচারী পুঁজিপতিদের বৈশ্বিক সংগঠন বিশ্ব ব্যাংক যেমন উদ্দেশ্যমুলক মিথ্যার দায়মুক্ত নয়, তেমন 'দারিদ্র বিমোচনে' ক্রিয়াশীল কথিত উন্নয়ন পন্থী-শান্তিকামী পন্ডিত কুল ও পরজীবীগোষ্ঠিও যুক্তিসম্মত সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নয়। ফলে যেমন বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফ তেমন তাদের সহযোগি ও কৃপাধন্য সকল প্রতিষ্ঠান-সংগঠন ও সংস্থা অনুরূপ মিথ্যাচার তথা স্বীয় স্ববিরোধী ঘোষণা ও কার্যতৎপরতার স্ববিরোধীতায় স্বীয় ঘোষণাকৃত কপটাপূর্ণ লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ-অক্ষম ও অযোগ্য হতে বাধ্য বলেই জন্মের ৬৫ বছর পরও বিশ্ব ব্যাংক দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব যেমন গড়তে পারে নি, তেমন শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা সমেত দারিদ্রতার হার বৃদ্ধি করে অনিবার্য ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেনি বলেই ২০০৮ সালে হতে চলা আসা মন্দার দ্বারা সমগ্র দুনিয়াময় সৃষ্টি করেছে এক মহাদুর্যোগময় নৈরাজ্যিক দু:সহ দুরাবস্থা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেকারত্ব ও দারিদ্র। ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, গ্রীস, কানাডা বা আমেরিকা কেউ এড়াতে পারেনি পুঁজির লালাট লিখনের এই জন্ম কলংকজাত দুর্যোগ ।

উল্লেখ্য- সি.আই.এ ও বিশ্ব ব্যাংক সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থার দেয় ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা হিসাবপত্র অনুযায়ী বিগত ২০১০ সালে পৃথিবীর মোট প্রায় ৩০০ কোটি লেবর ফোর্স পৃথিবীর মোট প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের প্রত্যেকের মাথাপ্রতি বার্ষিক আয় ১১,২০০ মার্কিন ডলার এ উন্নীত করলেও , ঐ বছরেই ৬০ লাখ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে

এবং ২২০ কোটি মানুষ বার্ষিক ৭২০ মার্কিন ডলার ব্যয় করার সামর্থ লাভ করেনি এবং ১২০ কোটি মানুষ দৈনিক ১.২ ডলার ব্যয়ের অক্ষমতায় নিপতিত তথা চরম দুরবাস্থায় শিকার হয়ে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণাদি ভোগ-ব্যবহারের ন্যুনতম সুযোগ হতেও বঞ্চিত হয়েছে। আবার ঐ বছরেই মন্দাক্রান্ত খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকুরীচ্যুতি ও বেকারত্বের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে পৃথিবীর মোট উৎপাদন প্রায় ৬৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, অথচ, মোট মজুতের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। মিশর, তিউনিশিয়া, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স, ইংলন্ড, আমেরিকা-কানাডা সহ নানান দেশে যে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, নৈরাজ্য-লুন্ঠন, হত্যা-খুন ও সন্ত্রাস এবং যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে তার সামুহিক ও সমোপস্থিত কারণ বটে ঐ বিশাল অংকের মজুত।

অতীতে সামগ্রীর অভাবে -দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, দেশান্তরী হয়েছে, কিন্তু পণ্য উৎপাদনের বর্তমান সমাজের অতিরিক্ত পণ্যের ভারে যেমন বিদায় নিচ্ছে অনেক শাসক-রাষ্ট্রিক অধিকর্তা বিশেষ তেমন প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে বহু ধরণের সামাজিক সমস্যা-সংকট এবং ক্রমেই নি:স্ব হতে নি:স্বতর হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। বাদ যাচ্ছে না পুঁজিপতিও। কেবলমাত্র ২০১০ সালেই আমেরিকার ৪০০ বিলিয়নিয়ার তাদের বিপুল পরিমাণ পুঁজি হারিয়েছে। ধ্বস নেমেছে বহু দেশের শেয়ার মার্কেটে। দেউলিয়া হয়েছে বহু প্রতিষ্ঠান ও বহু ব্যক্তি। টানা ১৬ বছর যাবৎ বিশ্বের ১ নম্বর ধনী ব্যক্তিটিও তার স্থান অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। হাল আমলের বিশাল পরিমাণ মজুত- পুঁজিতন্ত্রী সমাজের একদিকে ভয়ানকরকমের প্রাচুর্য অন্যদিকে চরম নি:স্বতা ও দারিদ্র, দৈন্যতা-দুর্দশা, বর্বরতা- নগ্নতা যেমন প্রকটভাবে প্রকাশ করছে তেমন ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্রী সমাজের -সামগ্রীকভাবে সমগ্র মানবজাতিতো নয়ই এমনকি কেবলমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণীকেও রক্ষায় কেবল অসমর্থই নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণীর মালিকানা তথা ব্যক্তিমালিকানাকে রক্ষায় পুঁজিতন্ত্রী সমাজের চরম অক্ষমতা-অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার উপযুক্ত নজির সমেত মৃতবৎ পুঁজিতন্ত্রেও স্বাধীনতা-মুক্তি, উন্নয়ন ও শান্তি ইত্যকার মানব দরদী বুলিবাগিসতা ও প্ররোচনার অসারতা, ভন্ডামি, প্রহসন, এবং পুঁজিতন্ত্রী সম্পর্কের স্ববিরোধীতা ও স্ব-বৈরীতার চিত্র বটে।

অত:পর, এটি এখন প্রমাণিত সত্য যে, বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বৈশ্বিক সিন্ডিকেটের বৈশ্বিক কর্তৃত্বের মৃতবৎ পুঁজিতন্ত্র নিজেকে নিজের জন্মদোষেই আবারো সংকটে ফেলে কার্যত বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফেরও ব্যর্থতা-অযোগ্যতা ও অক্ষমতা নিশ্চিত করে এমনকি ইটালী-ফ্রান্সের রাষ্ট্রীক অধিকর্তাদের প্রকাশ্যে নাজেহাল করা সমেত সাম্প্রতিক নৈরাজ্যিক ঘটনাবলীর তান্ডবলীলা এবং গৃহযুদ্ধ ও আঞ্চলিক যুদ্ধ বা নানান স্থানে যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষাবস্থা কায়েম ইত্যাদির নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় বিদ্ধ ও বিধ্বস্ত করছে মানবজাতিকে। পুঁজির সৃষ্ট পুন:পুন সংকটের পৌন:পুনিক মন্দায় পুন:পুন পুঁজি হারিয়ে ক্রমাগতভাবে ব্যক্তিমালিকানার আওতা-ক্ষেত্র ক্রমাগত সংকোচিত করে প্রতিবারই বহু পুঁজিপতির সমষ্টিগত মালিকানার বহু বহু প্রতিষ্ঠান জন্ম দিয়ে কার্যত ব্যক্তিমালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানার দিকেই ধাবিত বটে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ ।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় খাত সৃষ্টি সহ এ যাবৎ সৃষ্ট যৌথ মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিমালিকানার পক্ষেই ক্রিয়াশীল বলেই যতো চেষ্টা-অপচেষ্টাই পুঁজিপতি শ্রেণী করুক তাতে অতি উৎপাদন সংকট সৃষ্ট মন্দার কবল হতে রেহাই পায়নি এবং পাবে না যতোক্ষণ না প্রকৃতই নৈরাজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট যুগপৎ প্রাচুর্য্য ও দারিদ্রের সৃষ্টির স্ববিরোধী প্রক্রিয়ার অবসান না হয়। তবে উৎপাদন উপায়ের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেবলই সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী সমাজের সকলের অংশগ্রহণ ও সকলের সম্মিলিত পরিকল্পিত উৎপাদনী ব্যবস্থাই কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্রী নৈরাজ্যের উপযুক্ত ও কার্যকর সমাধান । অত:পর, অনুরূপ সমাধান তথা সাম্যতন্ত্রই সংকটাপন্ন পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ঐতিহাসিক নিয়তি ।

পুঁজি নিজ ঐতিহাসিক পরিণতিতে নিয়তিবরণের পূর্বতক টিকে থাকার চেষ্টা করবে; সেজন্য শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত-বিভক্ত করবে এটা যেমন স্বাভাবিক তেমন পুঁজিতন্ত্রের নিয়মেই পুঁজি হারানো বা পুঁজি হারানোর মতো অবস্থায় উপনীত বুর্জোয়া শ্রেণীর নানান গোষ্ঠী-গোত্র ইত্যাদি প্রতিপক্ষ অপরাপর পুঁজিপতি গোষ্ঠী-গোত্রের সহিত নানান সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। তবে, আন্ত:বিরোধ ও আন্ত:বিবাদে লিপ্ত পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশবিশেষ বিশেষত সুবিধা প্রত্যাশী বা ক্ষুব্ধ অংশ নিজেদের জয়-বিজয় হাসিলে সমর শক্তি বৃদ্ধিতে এমনকি শ্রমিক শ্রেণীকেও নিজেদের দলে-কাতারে ভিড়াতে নানান বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে। জানে প্রতিশ্রুতি পূরণ তারা করবে না বা তা পূরণ হওয়ার মতো প্রতিশ্রুতি নয়, তবু, প্রতরণামূলে প্ররোচিত ও প্রবঞ্চিতকরণে এমনসব দাবী সামনে নিয়ে আসে যাতে নীরিহ লোকজন সমেত শ্রমিক শ্রেণীও স্বপ্নাবিশষ্ট হয়ে শামিল হয় বিক্ষুব্ধ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সহ নানান ক্রিয়াকান্ডে।

উল্লেখ্য- অতীতেও পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় স্বার্থোদ্ধারে জনগণকে নানান ছলা-কলায় ভুলিয়ে-বালিয়ে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থকে ব্যাপক জনগণের স্বার্থ হিসাবে উদ্দেশ্যমুলকভাবে চিত্রিত ও চিহ্নিত করে দুরভিসন্ধিমূলে জনগণকে তাতে সম্পৃক্ত করেছে। হাল আমলেও পুঁজিতন্ত্রের মহামন্দা ও সংকটে পুঁজি হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তদাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণীসহ কর্মক্ষম অথচ বেকার বা ছদ্মবেকার ও অপরাপর গোষ্ঠীর সমর্থন লাভে শ্রেণীভিত্তিহীন ১% বনাম ৯৯% এর বানোয়াটি বিরোধ-বৈরীতার কাল্পনিক ধূয়া তুলে নানান ষ্ট্রীট দখলের নিমিত্তে নানান ধরণের ক্রিয়া-কর্ম করছে। এমনকি কোনো লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অনুরূপ কর্মকান্ডের উদ্যোক্তা না হলেও বা যারা তদার্থে উদ্যোক্তা তারা কেউ প্রকৃতই পুঁজিতন্ত্র বিরোধী না হলেও বা উদ্যোক্তরা কেবলই ব্যাংক পুঁজির দৌরাত্ম কমানোর দাবীতে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রিক ব্যয় সাশ্রয় করে ভুয়া মানবাধিকার সনদ বাস্তবায়নে রাষ্ট্র সমুহকে আরো বেশী মাত্রায় উদ্যোগী হতে বলা সহ ৯৯% জনের ৯৯% ভাগ মালিকানা প্রতিষ্ঠার দাবী জানালে অনুরূপ দাবী কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তার কোনো সদোত্তর না দিলেও এবং ভুলক্রমেও সামাজিক মালিকানার স্বপক্ষে ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ-বিনাশের দাবী তুলে নাই। তবু এসকল অবাস্তব ও অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া কার্যকরণের ক্রিয়া-কলাপকে পুঁজিতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করছে নানান দেশের দেশপ্রেমিক লেনিনবাদীরা। অথচ, ১% বা ৯৯% নয়, বরং পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির মালিক এবং পুঁজি উৎপন্নকারী শ্রমিক পুঁজির

মালিক নয়; তাই পুঁজিতন্ত্রে শ্রম শক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ-বৈরীতা বিরতিহীনভাবে বিদ্যমান। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রে মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী বনাম শ্রমিক শ্রেণীর। এই উভয় শ্রেণীর বিরোধ-বৈরীতার উপযুক্ত সমাধান হচ্ছে শ্রম শক্তি বেচা-কেনার অবসান। অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার অবসান তথা সমাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা। কাজেই, বর্তমান যুগে যেকোনো আন্দোলনে যদি প্রথম বা ১ নম্বর দাবী হিসাবে ব্যক্তিমালিকানার অবসানের কর্মসূচি গৃহীত বা উত্থাপিত না হয় তবে তাতে যতো সংখ্যক শ্রমিকই অংশ গ্রহণ করুক না কেন তা- কোনো মতেই পুঁজিতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন হতে পারে না।

তাছাড়া, পুঁজিতন্ত্র উৎখাত-উচ্ছেদ ও বিলুপ্তিতে যেহেতু কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী যোগ্য ও উপযুক্ত সেহেতু শ্রেণী মুক্তির লক্ষ্যে গঠিত শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিশ্ব সমিতি ছাড়া পুঁজিতন্ত্র বিরোধী ও বিনাশী আন্দোলনও কার্যতই হতে পারে না। যতোই কথিত আন্দোলনকারীরা বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা দিক তাতে কিন্তু বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন হিসাবে তা বিবেচিত হতে পারে না। তবে, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্র যেহেতু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় বৈশ্বিক ভাবে সেহেতু পুঁজিপতি শ্রেণীর নানান অংশ যারা পুঁজিতন্ত্রেই পুঁজিতান্ত্রিক নিয়মেই ক্ষতিগ্রস্ত তারাও নিজেদের সুযোগ-সুবিধা হাসিলে প্রচেষ্টা চালাতে হয় বৈশ্বিকভাবেই।

কিন্তু, লেনিনবাদী কমিউনিস্টরা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার পন্থী বলেই জাতিপ্রেমিক-দেশপ্রেমিক। তবু সমাজতন্ত্রের দাবীদার লেনিনবাদী পার্টিগুলো সমানে যোগ দিচ্ছে হালের ১% বনাম ৯৯% এর বৈশ্বিক ক্রিয়াকান্ডে। চোর-ডাকাত, খুনি-বজ্জাত, তস্কর-জোচ্চুর, পেশাদার রাজনীতিক-আমলা, দোকানদার-ব্যবসায়ী, ইন্ডেন্টার-ঠিকাদার, উকিল-মুক্তার, সেনা-পুলিশ কর্তা, ধর্মবেত্তা- এনজিও কর্তা, কৃষক -নৌকা ও জাল বা জলার মালিক, পরিবহন ও সেবাখাতের মালিক, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার মালিক গয়রহ কি উল্লেখিত ৯৯% জনের কাতারভুক্ত নয়?

এরা কি ব্যক্তি মালিকানার বিরোধী না কি পুঁজিতন্ত্রের নিয়মে কৃষক সহ মধ্যবিত্তের ভগ্নাংশ বিশেষই নয়, বরং হালের মন্দায় পুঁজি হারিয়ে শোকে-তাপে ও যন্ত্রণায় উন্মত্ত হয়ে শ্রম শক্তি বিক্রেতার অনিবার্য পরিণতি বরণ না করতে বা তদানুরপ নিয়তি হতে রেহাই পেতে পুঁজি হারানো ব্যক্তিরা আবারো পুঁজির মালিক হতে চায় অথবা লোকসানী বা ক্ষতিগ্রস্ত দের আর যেন পুঁজি হারাতে না হয় সেজন্য বিহীতাদি চায়, অর্থাৎ ইতিহাসের নিয়মে বিলীনকৃত ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় ও সংরক্ষায় নিজেদের মালিকানা বা অবলুপ্ত মালিকানার পুনর্বহালের দাবীতে ক্রিয়াশীল বলে এই সকল ব্যক্তি-গোষ্ঠী কেবল রক্ষণশীলই নয়, বরং প্রতিক্রিয়াশীল; কারণ পুঁজিতন্ত্রের ক্রিয়ার বিপরীত অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া তথা ইতিহাসের চাকাকে টেনে পিছনে নিতে চায় বা পশ্চাদদিকে ঘুরাতে চায় তারা । মুলত, পুঁজিতন্ত্র বিরোধী ও বিনাশী নয় বলেই বা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নয় বলে বা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির নিমিত্তে ক্রিয়াশীল নয় বলেই লেনিনবাদীরা অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়া-কর্মে যুক্ত ও জড়িত হয়। কেউ কেউ আবার অজ্ঞতা-অসচেতনা প্রসুত সমর্থন করে। যেন-তেন প্রকারে মুক্তি সাধন সে শ্রমিক শ্রেণীর কর্ম নয়, বরং সংগঠিত আন্দোলন এবং একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমেই কেবলমাত্র পুঁজিতন্ত্র বিলুপ্ত করা সম্ভব।

তবে, পুঁজিতন্ত্রী হয়েও বা পুঁজিতন্ত্রের ক্ষয়-ক্ষতি হতে রক্ষা পেতে ছোট-বড় নানান ধাঁচের পুঁজিপতিরা যে ১% বনাম ৯৯% এর দাবী তুলছে তাতে কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের অসারতা-বৈপরীত্য ও বৈরীতা এবং স্ববিরোধীতাই প্রকটভাবে উন্মোচিত হচ্ছে। তবে, লেনিনবাদের ভন্ডামি ও প্রতারণার মতোই নি:শেষিত হবে বটে এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতাও দখল নয় বরং ষ্ট্রীট দখলওয়ালা ১% বনাম ৯৯% এর কথিত আন্দোলন। কিন্তু তাতে যেমন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবে তেমন শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী মুক্তি বিষয়ে সচেতন হবে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী। এটিও পুঁজিতন্ত্রের যেমন উভয় সংকট তেমন ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ।

(১৩) সামন্ততন্ত্রী সমাজের গর্ভে সৃষ্ট পণ্য উৎপাদনী শক্তির স্বীয় চাহিদা মতো পুঁজিতন্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সামন্ততন্ত্র উৎখাতে বিজ্ঞানের বিদ্রোহে সাড়ম্বরে যোগ দিয়েছিল পুঁজিপতি শ্রেণী নিজ পুঁজির বিকাশের স্বার্থে। সামন্ততন্ত্রী শোষণমূলক ব্যবস্থার কার্যকরতায় দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক বিধি-বিধান অর্থাৎ ধর্মকে ঘসা-মাঝা বা কিঞ্চিত সংস্কার করে বহাল রাখা হলেও বা ধর্মের বিপরীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় শামিল থাকলেও যখনই পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের বিকাশের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে স্বীয় উচ্ছেদের দরজায় দাঁড়ালো তখন হতেই একদা বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে পরিণত হয়ে নিজের গৌরবান্বিত অতীতকে কলংকিত করে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে হয়ে পড়লো বর্তমান নয়, অতীত আশ্রয়ী । অবশ্য পুঁজিতন্ত্রী সমাজও হচ্ছে মৃত শ্রম কর্তৃক জীবন্ত শ্রমকে আত্মসাৎকরণের ব্যবস্থা। বিপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের পতন ও বিনাশ ঠেকাতে বিজ্ঞানকেও পুঁজির শৃংখলে বন্দী করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিলেও আবার পুঁজিরই শর্তে বিজ্ঞানের দ্বারাস্ত না হয়ে টিকতে পারে না বলেই বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির প্রভুত উন্নয়ন-বিকাশ সাধন করা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সৃষ্টি-বিকাশে উপযুক্ত -কার্যকর প্রতিবন্ধক- ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে কারপন্য করছে না । তাই ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা সহ ধর্মীয় সুড়-সুড়ি উসকাতে যুদ্ধ সহ হেন কোনো কর্ম নাই যা করছে না প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী।

পণ্য উৎপন্নকারী শ্রমিক শ্রেণী যদি ধর্মীয় মানসিকতায় আচ্ছন্ন থাকে তবে পণ্য ও মূল্য এবং যথারীতি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে স্বীয় ভূমিকা সম্পর্কে অসচেতন থেকে, পুঁজিপতিদের চিরদিন পুঁজিপতি থাকা এবং শ্রমিক শ্রেণীর দুরাবস্থাকে শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব মন্দভাগ্যের উপর অর্পন ও শ্রমিকের কথিত অপরাধী পাপকর্মের অলৌকিক দায়-দোষীতাকে চাতুরালী মূলে শ্রমিকের কাঁধে বর্তিয়ে কার্যত শ্রমিক শ্রেণীর যাবতীয় দুর্ভোগের জন্য দায়-দোষী পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যক্তিমালিকানাকে দায়-দোষী গণ্য না করে কেবলই ভাগ্য নির্ভর চিরন্তন সত্যকে মেনে নিয়ে এক ধরণের সাত্ত্বিকতা ও স্বপীড়নের আচার-আচরণ দ্বারা অভাব- অনটনের জীবনকে ভুয়াভাবে মহিমান্বিতকরণে প্ররোচনাকারী ভারতীয় বাংগালী কবি রবীন্দ্রনাথদের মতো আরো অনেক অনেক পরজীবী তথা বুদ্ধিজীবী'র নানা প্রতারণামূলত গীত-সংগীত ও মতাদর্শের অন্ধ-কানা গলি এবং চোরাবালিতে মানসিকভাবে অবস্থান করার মধ্যে কখনো কখনো ভুয়া শান্তি ও কল্পিত সমৃদ্ধি লাভে সুস্বাস্থ্য বিরোধী অতিমাত্রার কৃচ্ছ্বতার যন্ত্রণাগ্রস্ত জীবনাচারকে

স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিজেকে পীড়ন করে নিজের জীবনকে বস্তুতই দুর্বিসহ করা সমেত নিজ নিজ আয়ুষ্কালকে সীমিত ও হ্রাস করছে শ্রমিকদের কেউ কেউ ।

জগত ও জীবন সম্পর্কে এই ধরণের অন্ধত্ব ও অজ্ঞতা এবং শ্রেণী স্বার্থ বিষয়ে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি যতো বেশী মাত্রায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জারী রাখার বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত যতোবেশী মাত্রায় সাময়িকভাবে হলেও সফল হবে ততোবেশী মাত্রায় শ্রমিকের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করা যাবে। যদিচ, মানুষ স্বীয় ইতিহাসের স্রষ্টা হলেও নিজের ইচ্ছামতোই তা করতে পারে না। আবার চেতনা দ্বারা নয় মানুষ পরিচালিত হয় কার্যত সামাজিক শর্তাধীনে। যেমন পুঁজিপতি পুঁজির শর্তে উন্মাদের মতো নৈরাজ্যিক উৎপাদনে বাধ্য আবার শ্রমিকও জীবন ধারণের জন্য শ্রম শক্তি বিক্রি করতে বাধ্য।

অত:পর, শ্রম শক্তি বেচা-কেনার হেতুবাদে ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ-বৈরীতামুলক শ্রেণী সম্পর্কের কারণেই পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী লড়াই করবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই, বুর্জোয়া শ্রেণী যতো অপচেষ্টা বা ষড়যন্ত্র-চক্রান্তই করুক না কেন সামাজিক নিয়মে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সত্য,যথার্থ ও অনিবার্য।

ফলে- বুর্জোয়া সমাজই জন্ম দিয়েছে একদিকে শ্রমিক শ্রেণীর যা না হলে বুর্জোয়া শ্রেণীর পুঁজি উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকে না পুঁজিপতির, অন্যদিকে বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশের মুল সুত্র তথা ইতিহাসের বস্তুতন্ত্রী ব্যাখ্যা অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক নিয়ম এবং পুঁজির গোপন রহস্য অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব ও উদ্বৃত্ত-মূল্যজাত বিরোধ তথা পুঁজির জন্মগত বৈরীতা ও স্ববিরোধীতায় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ঠাঁই নিবে ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্র স্বীয় রক্ষক-সংরক্ষক তাবৎ সংস্থা-সংগঠন ইত্যকার যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক জঞ্জালাদি নিয়ে এমন তত্ত্ব ও সূত্রাদির বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান উদ্ভাবনের সামুহিক ভিত্তি এবং শর্তও তৈরী করেছে খোদ পুঁজিতন্ত্র স্বয়ং । উনবিংশ শতাব্দিতে এই বিজ্ঞান আবিস্কার ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেন মার্কস-এ্যাংগেলস।

অত:পর, পুঁজিতন্ত্রী সমাজের মৃত্যু সনদ লাভকারী আতংকিত পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় মৃত্যু পরোয়ানা তামিলে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করতে তারই কবর খননকারী শ্রমিক শ্রেণীকে নতুন নতুন কায়দা-কৌশল তথা শ্রমিক শ্রেণীর -'মহান বন্ধু', 'মহান নেতা' বা 'মহান শিক্ষক'র ভূমিকায় বুর্জোয়া শ্রেণীরই কাউকে কাউকে নামিয়ে- সাজিয়ে হাজির করার দুরভিসন্ধিতে বিজ্ঞানী মার্কসকেও অতীব কৌশলে অবৈজ্ঞানিকতার বেপারী ও গুরু সাজিয়ে উদ্দেশ্যমুলকভাবে বিশ্বাসঘাতক-প্রতারক লেনিনকে বানোয়াটিমুলে গুরুর উপযুক্ত চেলা বানিয়ে চেলার নামযুক্ত তথাকথিত মতাদর্শ দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বিজ্ঞানকে- বিজ্ঞান নয়, বরং তথাকথিত আদর্শ রূপে চিহ্নিত এবং ঐ রূপ আদর্শের কানাগলিতে শ্রমিক শ্রেণীকে নিপতিত করার যাবতীয় চক্রান্ত করেছিল। এই চক্রান্তের সাফল্য হাসিলে পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির শেষ ভরসার স্থল-রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের অবস্থাকেই কাজে লাগাতে সক্ষম হল পৌন:পুনিক মন্দা-সংঘাত ও যুদ্ধ এবং ১ম বিশ্ব যুদ্ধের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত মরণাপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তথা সমাজতন্ত্রের শত্রু বুর্জোয়া শ্রেণী- নিজের পতন ঠেকাতে নিজেরই কতিপয় সদস্যকে সমাজতন্ত্রের

আল-খাল্লা পরিয়ে কার্যত পুঁজিপতি শ্রেণী সমাজতন্ত্রের আবেদন ও আবরণ সুচতুরভাবে ব্যবহার করে কার্যত রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র কার্যকরী করে রুশীয় বর্ণচোরা লেনিনকে শ্রেষ্ঠ 'মার্কসবাদী রুশি কমিউনিস্ট' সাজিয়ে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে সাময়িক কালের জন্য হলেও রেহাই পাওয়ার সুযোগ লাভ করেছে।
অনুরূপ সুযোগ প্রসারিত করার অন্যতম প্রধান হোতা লেনিনকে সমাজতন্ত্রের মুখ্য মোড়ল সাব্যস্তে 'মহামতি' লেনিনের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের সাথে দুনিয়ার প্রথম দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা মিশরীয় ফারাও ডাইনেস্টির ঘৃণ্য ও জঘন্য মূল্যবোধ-সংস্কৃতি ও নীতিমালা ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বলশেভিক পার্টির মতো এক জঘন্য স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল তথা লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দুনিয়ার দেশে দেশে রপ্তানি ও পত্তন করে ঐ পার্টিকেই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পার্টি প্রতিপন্নে দুনিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণী -বলশেভিক পার্টি ও বলশেভিক পার্টির এজেন্ট বা সমগোত্রীয় বা সমর্থক পার্টিগুলির পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে যতোভাবে সম্ভব বিশ্বাসঘাতক লেনিনকে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বানিয়ে লেনিনের চেলা ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন মাও,হোচিমিন, কিম, টিটু, হোক্সা, পল-পট, ফিদেল ইত্যকার তাবৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী ঘৃণ্য ঘাতক-হন্তারক ও বজ্জাত ব্যক্তি গয়রহকে শ্রমিক শ্রেণীর কথিত মহান নেতা- মুক্তিদাতা ও গুরু সাজিয়ে কিঞ্চিত রেহাই পাওয়ার যার-পর নাই অপচেষ্টা করা সত্ত্বেও পুঁজিরই স্ববিরোধী নিয়মে লেনিনের রাষ্ট্র যেমন টিকে নাই, তেমন লেনিনবাদ-মাও চিন্তা ইত্যাদির ভুয়ামি-বজ্জাতি ও ভয়ানক ক্ষতিকরতা এখন প্রমাণিত। অত:পর, বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষায় বুর্জোয়া হয়ে বুর্জোয়ার আপোষহীন শত্রু কমিউনিস্ট সাজা -এটিও পুঁজিতন্ত্রী সমাজের স্ব-বিরোধীতা ও দৈন্যতার প্রকাশ।

(১৪) যতোই পুঁজির পরিমাণ প্রসারিত হয়েছে ততোই পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধিত পণ্যের বাজারজাতকরণে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার সমানতালে উন্নয়ন ও উন্নতি সাধনে বাধ্য বটে পুঁজিপতি শ্রেণী। আবার পরিবহন ব্যবস্থার যতোই উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্বালানি বা শক্তির ব্যবহার। সৌরশক্তির মালিকানা নিয়ে এখনো দাবি উত্থাপিত না হলেও মহাকাশ গবেষণায় নিযুক্ত ১৫ টি দেশ প্রকারান্তরে মহাকাশের মালিকানা দাবী করে বেড়ালেও ধরত্রীতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রাপ্তি ও ব্যবহারে নানা দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী মুখোমুখি হচ্ছে পরস্পরের এবং ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হিংস্রতায়। পণ্যের বাজারের জন্যই দুনিয়া জয়-দখল করেছিল পুঁজিপতি শ্রেণী, গড়ে নিয়েছিল সমগ্র দুনিয়াটাকে নিজের ধাঁছে। এতে দেশে দেশে জন্ম হয়েছে বহু সংখ্যক পুঁজিপতি। উৎপন্ন হয়েছিল অতিরিক্ত পণ্য। বাজার সংকটে জন্মদাতা পিতার সাথে স্থানীয় পুত্রকুল অনিবার্য বৈরীতা-বিরোধীতায় লিপ্ত হয়ে নিজ পুঁজি বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক পিতৃদেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত যুদ্ধ লিপ্ত হওয়া সহ তথাকথিত জাতীয় মুক্তি- স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ইত্যাদির আওয়াজ তুলে জেফারসন্স-বলিবার প্রমুখরা পুঁজি সঞ্চলনের আবশ্যকীয় শর্ত- অবাধ বাণিজ্য এবং উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। একদা উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো যেমন অপরাপর দেশ-রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্ব-ক্ষমতা গ্রহণ করে কার্যত রাষ্ট্র হিসাবে নিজেরও ব্যভিচারিতার মাধ্যমে সত্যি সত্যি

রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছিল তেমন উপনিবেশিকতা বিরোধী কথিত স্বাধীনতার আন্দোলন কার্যত স্থানীয় পুঁজিপতিদের পুঁজির স্বার্থে ও সুবিধার্থে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করে প্রকৃতার্থেই রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা- এখতিয়ার ইত্যাদির বর্ধিত নয় খর্ব করেছিল।

অনুরূপ রাজনৈতিক বাতাবরণে পুঁজির পরিমাণ যতোই বাড়াতে থাকলো তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রস্থিত পুঁজিপতি গোষ্ঠী সমেত বুর্জোয়াদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ততোই বৃদ্ধি হওয়ায় অনিবার্যভাবে সংকট-মন্দায় আক্রান্ত বুর্জোয়ারা ২য় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী তিন শক্তিধর রাষ্ট্র-যথা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব ব্যাপী তাদের দখল-আধিপত্য কার্যত পুঁজির কর্তৃত্ব বজায় রাখতে - জাতি সংঘ, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করে। এতে- কার্যত সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার যেমন হারালো তেমন সমগ্র দুনিয়া প্রত্যক্ষভাবে বিজয়ী পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্যে নিপতিত হলো। তাই, বিকাশকালীন পুঁজির ঐতিহাসিক নীতি-উপনিবেশিকতার প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা শেষ ও নি:শেষ হল।

ফলে- ২য় বিশ্ব যুদ্ধের ফসল জাতিসংঘের ঘোষিত মূলনীতি ও লক্ষ্য মূলেই সমগ্র দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল অনেক রাষ্ট্র এবং লেনিনবাদী কমিউনিস্টারাও নিপীড়ত বুর্জোয়ার বন্ধু ও সমর্থক এবং স্বার্থের পাহারাদার হিসাবে লেনিনীয় নীতিতে অনুরূপ নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অত:পর, সমগ্র দুনিয়ায় এখন রাষ্ট্র সংখ্যা প্রায় ২০০। যতো রাষ্ট্র ততো রাষ্ট্রের গন্ডীতে আবদ্ধ দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী কথিত জাতীয়তাবাদী নেতারা সমেত কথিত কমিউনিস্ট লেনিন-মাওদের দেশপ্রেমের রশিতে বন্দী হয়ে আরো ততোধিক ভাগ-বিভাগে বিভাজিত হয়েছে। শ্রেণী হিসাবে গঠিত নয়, শ্রেণী চৈতন্যে শাণিত নয়, বরং বিভক্ত-বিভ্রান্ত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের দুর্গন্ধময় আবর্জনার ভান্ডার ও উৎস ব্যক্তিমালিকানা হাসিলের লালসা সমেত নানান জাত-জাতির সংকীর্ণতা ও বিভিন্ন ধর্মের কুপমন্ডুকতা, মূঢ়তা ও হিংস্রতার মধ্যে নিপতিত ও বলি হচ্ছে বটে শ্রমিক। আপাতদৃষ্টিতে বুর্জোয়াদের কিঞ্চিত সুবিধা হলেও তাদেরই রক্ষক-সংরক্ষক রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাংক ইত্যকার প্রতিষ্ঠানাদির অক্ষমতা-ব্যর্থতা ও অকার্যকরতা দিবালোকের মতো যেমন স্পষ্ট হচ্ছে তেমন ইহলৌকিকতার পণ্যের পরলৌকিকতার উপর নির্ভরতার নীতিগত নির্ভরতা এবং ভুয়া-মেকি দেশপ্রেম, বানোয়াটি জাতিবাদের ভুয়া প্রেমের কানাগলিতে নানান জনের এমনকি সশস্ত্র ঘুরাঘুরির কারণে বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা বাড়ছে বটে পুঁজি ও পণ্যের বৈশ্বিক অবাধ প্রবাহে।

অন্যদিকে, রাষ্ট্র সংখ্যা যতো বেড়েছে ততোই ধরিত্র ভাগ-বিভাগ হয়েছে। ফলে ধরিত্রীর খনিজ, জলজ ও বনজ সম্পদ রাষ্ট্রিক সীমা-গন্ডিতে আবদ্ধ হয়েছে। এতে কোনো কোনো রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের যেমন কর্তৃত্ব হাসিল করেছে আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় জ্বালানি ইত্যাদির কর্তৃত্ব না পাওয়ায় কেবলমাত্র জ্বালানি নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে নানান জটিলতা-প্রতিকুলতা, এবং চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে যেমন বাড়ছে দাম তেমন বাড়ছে দুর্নীতি এবং আঞ্চলিক সংঘাত ও যুদ্ধ ইত্যাদিও । বাদ যাচ্ছে না পানি ও মিষ্টি পানির বাক-বিতন্ডা, হিস্যা ইত্যকার বিষয়ে নানান জুট-ঝামেলা, মামলা-মোকদ্দমা, হামলা-আক্রমন, সামরিক মহড়া বা কখনো কখনো যুদ্ধ।

কৃষি ও কৃষিজাত ফসল ও ফলন নিয়েও অনুরূপ সংকট-সমস্যা বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কোথাও কোথাও ভূমি থাকছে অনাবাদি আবার কোথাও কোথাও কর্ষণযোগ্য ভূমির ভয়ানক অভাব অথবা কোথাও কোথাও খাদ্যের দারুন সংকট আবার কোথাও কোথাও খাদ্য ব্যবহৃত হচ্ছে জ্বালানি হিসাবে। ভারত-চীন, বাংলাদেশ-পাকিস্তান ইত্যকার এশীয় দেশগুলোতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটছে। আবার কানাডা, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি সহ আরো বহু দেশে বিপুল পরিমাণ ভূমি যেমন পতিত তেমন জনসংখ্যাও অকুলান। তাইতো, রাষ্ট্রিক বেড়াজালে আটকাতে চাইলেও প্রকাশ্য-গোপনে ব্যাপকহারে হচ্ছে অভিবাসন। আবার অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের নিয়েও হচ্ছে নানা রকমের সমস্যা। এই সবই পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার যেমন ফসল তেমন বিড়ম্বনা। শ্রমিক শ্রেণীসহ জনজীবনের এহেন সংকট-সমস্যা সৃষ্টি কারী পুঁজিতন্ত্র এসকল সমস্যা মোকাবেলায় যে অক্ষম ও অযোগ্য তাওতো এখন সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। অথচ, সমাধান আবশ্যক । তাই মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র নিজ পতন ও বিনাশ ঠেকাতে যতোই বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ততোই পুঁজিতন্ত্রের দেউলিয়াপনা, অব্যবস্থাপনা, নৈরাজ্যপনা কেবল বাড়ছে আর বাড়ছে। পুঁজির জন্ম শর্তেই এরূপ বৈরীতা ও স্ববিরোধীতা পুঁজিতন্ত্রের ললাট লিখন।

(১৫) ঋণ দাস সদস্য রাষ্ট্রকে সন্দেহভাজন অপরাধী গণ্যে কঠিন-কঠোর নজরদারী-খবরদারীর মাধ্যমে একটি মাত্র কেন্দ্র হতে সমস্ত দুনিয়ার পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষায় ক্রিয়াশীল আই.এম.এফ এর ব্যর্থতায় বিগত শতাব্দির ৮ এর দশকে পুঁজিতন্ত্র মন্দার কবলে নিপতিত হলে সংকটোত্তরণে রাষ্ট্রায়ত্তখাতের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রহসনমুলকভাবে রাষ্টগুলোকেই দায়িত্ব প্রদান করা হল তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতি কার্যকরণে। তারই ধরাবাহিকতায় ও ইতোমধ্যে রাষ্ট্রিয় পুঁজিতন্ত্রের আনুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট প্রপার্টি হোল্ডারদের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির অনুকুলে ব্যক্তি পুঁজির স্বশরীরে ও স্বরূপে উপস্থিতির অনুকুল পরিস্থিতি ও পরিবেশে- লেনিনীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে যায়; এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাভোগীদের সঞ্চিত ও পুঞ্জিভূত পুঁজির সঞ্চালন সুযোগ আবশ্যকতায় লেনিনের রুশ রাষ্ট্র বহুধাভাগে বিভক্ত হয়ে অবাধ-মুক্তবাজারী অর্থনীতিতে অবতীর্ণ হয়; সংগে লেনিনবাদী মতাদর্শও অতিতের বিষয়ে পরিণত হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির শর্তে দুনিয়াময় পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়ত নিশ্চিতিতে সমগ্র দুনিয়াকে একটি মাত্র বিশ্ব সাব্যস্তে পুঁজিপতিদের কথিত বিশ্বায়ন রূপায়নে গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিশ্ব পুঁজির বিশ্ব শাসক সংস্থা- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। এতে সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কঠোর দমন তথা দন্ডযোগ্য অপরাধীই শুধু হল না, কার্যত নিজ ভূখন্ডে নিজ ইচ্ছামতো ট্যাক্স-ট্যারিপ আরোপের ক্ষমতা হারিয়ে রাষ্ট্রগুলো কেবল ঠুঠু জগ্গাথই নয়, বরং মহাপ্রতাপশালী পুঁজির স্বার্থবাহী মহাক্ষমতাধর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হুকুম বরদার লাঠিয়ালে পরিণত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নের ধারা অব্যাহত রাখতে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নকারী শ্রমিক শ্রেণীকে যতোভাবে সম্ভব দমন-পীড়ন করার এক মহাক্ষমতাধর যন্ত্র হিসাবে।

জাতীয় পুঁজির বিকাশ, দেশপ্রেমিক জাতীয় পুঁজিপতির স্বার্থবাহী জাতীয় রাষ্ট্র, জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, এবং তদনিমিত্তে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা

যুদ্ধ বা আন্দোলন ইত্যাদির নামে কার্যত পুঁজির উপনিবেশিকতার নীতির সমাপ্তি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর আন্ত:বিরোধ-বৈরীতায় সৃষ্ট নতুন নতুন তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো নিজস্ব ক্ষমতা-স্বকীয়তা হতে পূর্বাপর বিশ্ব ব্যাংকের সদস্য হিসাবে বঞ্চিত হলেও কর-রাজস্ব বা দেশী-বিদেশী পণ্যের যাতায়তে কিঞ্চিত পরিমাণে হলেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার যোগ্যতায় রাষ্ট্র হিসাবে কার্যকরতার কৃত্রিম দাবী করতে পারতো। কিন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে কেবলই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অনুগত দাসে পরিণত হয়ে প্রকৃতার্থেই তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবীর অসারতা নিশ্চিত করেছে। ফলে- বুর্জোয়া দল ও নেতৃত্ব সহ লেনিনবাদীদের এত্তোদিনকার দাবী তথা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, প্রগতিশীল জাতীয়তা, জাতীয় মুক্তি, দেশপ্রেম ও দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া অথবা দেশপ্রেমের চ্যাম্পিয়ন- লেনিনবাদী কমিউনিস্ট এবং গণতন্ত্র ইত্যকার বক্তব্য তাল-গোল পাকিয়ে স্বীয় অন্ত:সার শূন্যতা নিশ্চিত করে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রীদের সকলকেই কথিত বিশ্বায়নপন্থী হতে বাধ্য করেছে।

তবে, লেনিনদের কালেও কথিত দেশপ্রেমিক বা জাতীয় মুক্তিকামী তথা উপনিবেশ বিরোধীরা অনুরূপ স্ববৈরীতায় লিপ্ত ছিল তারতো বড় প্রমাণ লেনিন-ট্রটস্কির প্রতিষ্টিত কথিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক। তাছাড়া, লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে নানান দেশীয় লেনিন-গান্ধী বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি বা লেনিন-ষ্ট্যালিনদের লীগ এগেন্যাষ্ট ইম্পিরিয়েলিজম এর ১৯২৮ সালের সম্মেলনে ভারতীয় অরবিন্দ ও নেহেরুর মতো আরো অনেক দেশের অনেকের যোগদান। তাই, দেশপ্রেমিক ও লেনিনবাদীদের জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাদি যে, রাজনৈতিক দ্বিচারিতা ও স্ববিরোধীতার তাও প্রমাণিত।
তদার্থে নজির হিসাবে উল্লেখ্য- ভারতে জন্মে কেউ কেউ বিদেশে পড়াশুনা করে পানাহার সহ বিদেশী আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়েও বনেছে স্বদেশী; এবং স্বদেশী পণ্যের প্ররোচক ও দেশপ্রেমের চবকদাতা গান্ধী, নেহেরু- জিন্নাহরা যদি সত্যি সত্যি তাই হতেন তবে বিদেশী স্যুট-কোর্ট, বুট-টাই পরিহিত জিন্নাহ সাহেব বিদেশী বিয়ে করেছেন কেন? অথবা, নেহেরুজী স্বীয় কন্যাকে বিদেশী তথা ইংরেজী স্কুলে পাঠিয়েছিলেন কেন? অথবা, প্রিয় স্বদেশ ভারতকে তারা ভাগ-বিভাগ করলেন কেন? অথবা, স্বদেশী হয়েও স্বদেশীকে হত্যা-খুন, জখম, লুন্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও বাস্তুচ্যুত করলেন কেন? অথবা, ভারত বিভাগে বিদেশীর দ্বারা স্বদেশের সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও কথিত স্বাধীনতার পরেও বৃটিশ রানির কর্তৃত্বাধীন কমনওয়েলথের সদস্য হলেন কেন? অথবা, স্বাধীনতা উত্তর দুই দেশেই গভর্ণর হিসাবে বিদেশীকে বহাল রাখলেন কেন? অথবা, বিদেশীদের সৃষ্ট আইন-কানুন, বিধি-বিধান, কোর্ট-কাছারী, আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও পুলিশ রেগুলেশন বহাল ও কার্যকর রাখলেন কেন? অথবা, আর্যযুগের নিদেনপক্ষে সুলতানী বা মোগলযুগের বিধান পুনর্বহালের মাধ্যমে ইংরেজ প্রবর্তিত শিশু বিবাহ নিরোধ আইন, ও বিধাব বিবাহ আইন বাতিল করলেন না কেন? অথবা, জাত-পাতের মনু সংহিতা হুবুহু কার্যকর করেননি কেন? অথবা, বিদেশী ধর্মের বিধি-বিধান সহ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন বহাল রাখলেন কেন? অথবা বিদেশী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক মতবাদ- 'স্যাকুলারিজম' ভারত রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে গ্রহণ করলেন কেন? অথবা, ভারতীয় গুরুর

টোল ব্যবস্থায় ফিরে না গিয়ে ইংরেজ সৃষ্ট এডুকেশন ব্যবস্থা বহাল রাখলেন কেন? অথবা, স্বদেশের চরকা পুঁজারী হয়েও অটো টেকস্টাইল সহ বিদেশীদের সৃষ্ট-প্রতিষ্ঠিত বা বিদেশীদের সাহচর্যে, আনুকুল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বা বিদেশীকে সহযোগিতা করার ঈনাম বাবত লব্ধ পুঁজি, প্রতিষ্ঠিত কল কারখানা, ব্যাংক-বীমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিলীন ও বিলুপ্ত করে দেশীয় আদি যুগের সরল অর্থনীতিতে ফিরে গেলেন না কেন ? অথবা, স্বদেশী চরকার সহযোগী নৌকা, গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী -টমটমের যুগে ফিরে না গিয়ে বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত রেলসহ নৌযোগাযোগের আধুনিক বাহন বাস্পীয় ইঞ্জিনের জাহাজ কেবল ব্যবহারই নয়, তদার্থে উন্নয়ন ও উন্নতি সাধন সহ বিদেশীদের উড়োজাহাজও ব্যবহার করলেন কেন ? অথবা, সকল রাষ্ট্রের স্বকীয়তা হরণ-ক্ষুন্নকারী বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের বৈশ্বিক ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার জানা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি দিয়ে নেহেরু-জিন্নাদের বৃটিশ-ভারতের সরকার আই.এম.এফের চুক্তিপত্রে ফান্ডের প্রতিষ্ঠাকালেই সহি-স্বাক্ষর করে সদস্য হলো কেন ? এত্তোসব সত্ত্বেও গান্ধী,নেহেরু, জিন্নাহরা দেশপ্রেমিক!? অথবা, ভারত পাকিস্তান, বা পাকিস্তান ভাগ-বিভাগের মতোই ভারতীয় লেনিনবাদীরা যে তাদের দল কথিত কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ-বিভাগ করছেন বিভাজিত দেশগুলির নামেই তাতে তাদের দেশপ্রেমতো বটেই দলীয় প্রেমও যে প্রশ্ন বিদ্ধ,তাওতো নিশ্চিত নয় কি ?

অথচ, এই বুর্জোয়া তান্ত্রিক-মহাত্ম বা গণতান্ত্রিক ও লেনিনবাদী পরজীবীরা কথিত জাতীয় মুক্তি হাসিল বা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভুয়া স্বপ্নে বিভ্রান্ত করে দুনিযার হাজার-লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে প্ররোচিত ও বাধ্য করেছে নানান ধরণের নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করা সহ যুদ্ধ-ইত্যাদির হাংগামা-বিড়ম্বনায় জীবন হারাতে। কি ভয়ানক স্ববিরোধীতা ও প্রতারণা ! একদিকে ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রিক গন্ডী থাকছে, অন্যদিকে এ সকল গন্ডীকে চুরমার করে ঘুড়িয়ে দিয়ে মহাক্ষমতাধর পুঁজি তার মালিককেও বাধ্য করছে সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়ত ও প্রবাহ নিশ্চিতি কল্পে যাবতীয় বিধি-বিধান কার্যকরণে। তবু ব্যর্থ হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী বলেই হালের মন্দা অব্যাহত আছে ও প্রকট রূপ নিচ্ছে। অত:পর, এতোদিনকার বহুল চর্চিত কথিত গণতন্ত্র ইত্যাদিও জৌলুশ হারিয়ে পুলিশ-সেনাবাহিনী দ্বারা বর্বরভাবে দমন করছে নৈরাজ্য ইত্যাদি। পুঁজির এমনতরো মজুত সংকট ও কেন্দ্রীভবনের হেতুবাদে পুঁজিতন্ত্রী ধারা অব্যাহত রাখতে ক্রমাগতভাবে সকল রাষ্ট্র হয়ে উঠছে কেবলই স্বৈরতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারিতার আধার বিশেষমাত্র । ভোটাভোটির সরকার নাগরিকগণের সাথে কেবলই স্বৈরতান্ত্রিক-স্বেচ্ছাচারী আচরণ করবে এটা যেমন মানা কষ্টকর তেমন যতোই বদল হবে সরকার বা শাসক দল ততোই ক্রমাগতই এগিয়ে যেতে হবে নির্বাচনী ওয়াদা ভংগ- বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ইত্যকার মহাসড়কে শাসক বুর্জোয়াকে। সুতরাং, নৈরাজ্য বাড়ছেই এবং পাল্লা দিয়ে বাড়বে স্বৈরতন্ত্র। এটিও পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার সংকট-সমস্যা ও স্ববিরোধীতা।

(১৬) উদ্বৃত্ত-মুল্যই যেহেতু পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য পুঁজিপতির। তাই উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুবিধা হাসিলের স্বার্থ বৈ অন্য কিছু বিবেচনায় নিতে রাজী নয় পুঁজিপতি শ্রেণী। অত:পর, উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বিষাক্ত বর্জ্য যত্র-তত্র নিক্ষেপ, মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নি:সরণ, কেবলই নিজ নিজ প্রয়োজনে অপরিকল্পিতভাবে পানির যথেচ্ছ

ব্যবহারে পানির স্বাভাবিক গতি-প্রবাহে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি, রাসায়নিক ও কীটনাশক ইত্যাদির নৈরাজ্যিক ব্যবহার, অপরিকল্পিত রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, বৃক্ষ নিধন, পাহাড় বিনাশ ইত্যাকার নানান ক্রিয়াদির মাধ্যমে ভূমির ক্ষয়-অবক্ষয়, জলাবদ্ধতা, প্লাবন, পানি দুষণ, বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ, উষ্ণতা বৃদ্ধি ও ওজনস্থরে নিত্য ক্ষতি সাধন, বরফ গলা বৃদ্ধি, ভূ-চিত্রের রদ-বদল ইত্যকার নানান দোষ- দোষে পরিবেশ-প্রতিবেশ মারাত্মকভাবে দুষিত ও বিপন্ন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পরিবর্তিত হচ্ছে জলবায়ু। বিপর্যয়কর পরিস্থিতির ভয়বহতা আঁচ করতে পেরে পুঁজিতন্ত্রের বিশ্ব মোড়লরা নানান বৈশ্বিক সম্মেলন ইত্যাদি আয়োজন করে কার্যত স্বীকার করছে যে, সর্বপ্রকার দুষণ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকারী বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের বিষক্রিয়ায় উৎপন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ক্রমবর্ধিতভাবে যে সকল সমস্যা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করছে, তন্মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বা পানি সমস্যা বা অনুরূপ বৈশ্বিক সমস্যাগুলির সমাধান স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে করা সম্ভব নয়। পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অনুরূপ নানান দুষণ হতে মুক্তি পাওয়া যে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থায় সম্ভব নয়, তা যেমন পুঁজিতন্ত্রী মোড়লরা স্বীকার করছে না, তেমন বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান করতে হলে যে তা বৈশ্বিকভাবেই করতে হবে এইরূপ মতামত প্রকারান্তরে সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত নানান বৈশ্বিক সম্মেলন ইত্যকার ঘটনাবলী দ্বারা স্বীকার করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রিক গন্ডী বজায় ও বহাল রেখে বহুধাভাগে বিভক্ত পৃথিবীতে যে এমনকি জরবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যারও সমাধান প্রকৃতই সম্ভব নয়, তা কেবলই ব্যক্তি মালিকানার স্বার্থেই কবুল করছে না তাবৎ পুঁজিতন্ত্রী মোড়ল-বিশারদ গয়রহ । ফলে- পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করার দোষণীয় প্রক্রিয়া বর্ধিত হওয়া ছাড়া কমছে না বিধায় সুন্দর পৃথিবীটাও নিরাপদ নয় পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত বিপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে।

(১৭) লেনিনবাদের বদৌলতে বিনাশ ও বিলুপ্তি হতে সাময়িকভাবে রক্ষা পেলেও পুঁজির জন্ম শর্তেই পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা এক্কেবারে লেজে- গোবরে অবস্থায় উপনীত হয়ে নিত্যই দ্রুত হতে দ্রুততর গতিতে উত্থান-পতনের চক্রে ঘূর্ণিয়মান পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় শ্রেণী আধিপত্য রক্ষায় সামরিক খাতের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করে শেষত আনবিক বোমা ইত্যাদি মারাত্মক বিধ্বংসী বিস্ফোরক তৈরী করেছে এবং দিনে দিনে এই জাতীয় ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক সামরিক সড়ঞ্জাম প্রস্তুত করেই যাচ্ছে। তাছাড়া, নতুন নতুন সামরকি সরঞ্জামাদি প্রস্তুত না করে সামরিক খাতে বিনিয়োগকৃত পুঁজি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে যেমন সক্ষম নয়, তেমন দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে সামরিক কার্য-কলাপ অর্থাৎ হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত না হলে এখাতের পুঁজির সঞ্চালন সংকট তৈরী হতে বাধ্য। তাই, পুঁজির শর্তে পুঁজিতন্ত্র যুদ্ধ প্রবণ সমাজ।

২য় বিশ্ব যুদ্ধ সমাপ্ত হলেও কেন্দ্রীভূত পুঁজির বলে বলীয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নাগাসাকি-হিরোশিমায় ১৯৪৫ সালের আগষ্টে আনুবিক বোম নিক্ষেপ করে মুহূর্তেই অসংখ্য শিল্প, কল-কারখানা, বসতি, অবকাঠামো ও পরিকাঠামো সমেত হাজার হাজার মানুষকে খুন-জখম করে। মজুত পুঁজির চাপে-ভারে ভারাক্রান্ত-পিষ্ট ও সঞ্চালন তাড়নায় উন্মত্ত হিটলার যেমন পুঁজির সঞ্চালনে তথা পণ্যের মজুত কমাতে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে নিজেও স্বয়ং খুন হয়েছে, তেমন মার্কিনী আনুবিক হামলায় কেবল পুঁজিপতি শ্রেণীর শত্রু - শ্রমিক শ্রেণীই নয়, নিহত-আহত, পংগু ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে জাপানের

পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যক্তি বিশেষও। এই রূপ অসংখ্য যুদ্ধ ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পুঁজির স্বার্থে পুঁজিপতি শ্রেণী তার শত্রু- শ্রমিক শ্রেণীকেই হত্যা-খুন বা দমন-পীড়ন করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রতিদ্বন্দ্বি ও প্রতিযোগি পুঁজিপতিকেও হত্যা করে বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজের শত্রু ও পুঁজিপতি বিশেষকে হত্যাকারী। এ হেন স্বয়ংঘাতি পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে এখন যে পরিমাণ আনবিক বোমা মজুত আছে তাতে নাকি তামাম পৃথিবীকে অসংখ্যবার ধ্বংস করা যাবে। পুঁজি তথা ব্যক্তিমালিকানার স্বার্থে উদ্ভাবিত এরূপ ধ্বংসাত্মক- মারাত্মক বিস্ফোরক ও সামরিক সরঞ্জামাদি উৎপন্ন করে বুর্জোয়া শ্রেণী মানবজাতি সমেত পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হয়েছে বটে। কিন্তু তাতেও বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রের সংকট-সমস্যা বৃদ্ধি বৈ হ্রাস করতে পারেনি। ফলে- উচ্ছেদ আতংকে আতংকিত এবং মৃত্যু ভয়ে ভীত -অপরিণামদর্শী পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে কেবল শ্রমিক শ্রেণী নয়, বরং নিরাপদ নয় সমগ্র মানব জাতি এবং পৃথিবীটাও । সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রের কবর না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ হতে পারছে না মানবজাতি সহ ধরিত্রীও ।অত:পর, পুঁজির নিরাপত্তা বিধানে ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরী করে তারই ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষমতা-আতংকে আতংকিত পুঁজিপতি শ্রেণীও যে ভয়ানক নিরাপত্তহীনতায় আক্রান্ত তাওতো পুঁজিতন্ত্রের স্ববিরোধী স্বভাব।

(১৮) মহা বিশ্বের সব কিছু সম্পর্কে এখনো জ্ঞাত নয় মানবজাতি, তবে জানা-শুনার পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। কাজেই, মানব জাতির নিরাপদ ও সুন্দর-সাবলীল ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য কি সব অফুরন্ত ভান্ডার মহা বিশ্বে আছে তাও এখনো যথার্থভাবে অনুমিত নয়। তবে সম্ভাবনা যে অপার তা প্রায় নিশ্চিত। অন্যদিকে এমনকি ধরিত্রীর মোট সম্পদও এখনো নিরূপিত নয়। তাছাড়া, প্রকৃতির নানান উপকরণকে বহুমুখীনভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কাজে লাগানোর বহু তত্ত্ব ও তথ্য-প্রযুক্তি এখন মানুষের করায়ত্ত । নেট-মোবালাইসহ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব প্রযুক্তির কল্যাণে তথ্য ও যোগাযোগের সুযোগ অভাবিত। দেশ-জাতি বা রাষ্ট্র ইত্যকার তাবৎ ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গন্ডী ও বৃত্তের সকল সীমানা -বেড়া অস্বীকৃত ও অকার্যকৃত হয়ে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ পরস্পরের সহিত সংযোগ-সম্পর্ক স্থাপন করছে অহরহ। ব্যক্তিমালিকানার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে সামষ্টিক মালিকানা ও সামাজিক স্বেচ্ছা শ্রমের নানান বৈশ্বিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম । মৃত্যুর পরও কৃত্রিম হার্ট পিঠে ঝুলিয়ে নতুন ভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্থ শত শত মানুষ জীবনের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিব্যি দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে । জিন চিত্র আবিস্কৃত ও ষ্টীম সেলের কল্যাণে মানুষের মৃত্যু ঠেকানোর জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানী কুল। এসকল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকারী হয়েও পুঁজিতন্ত্রী সমাজ এসকল সুবিধাদির সার্বজনীন ব্যবহারের সুযোগ দিতে অপরাগ ও অক্ষম । উপরন্ত, পুঁজির লোভে খাদ্য, পানীয়, ঔষধ সহ নানান পণ্য ভেজাল-দূষণ করা সহ যাবতীয় দুষণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণী । তাই শ্রমিক শ্রেণী সহ বহু মানুষ কেবলই পুঁজিতন্ত্রী দুষণের যেমন শিকার তেমন আধুনিক চিকিৎসা ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত বলে নানান জটিল-কঠিন ও মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে নানান ভোগান্তির শিকার হওয়া সহ অকালে মৃত্যুবরণ করছে। এটিও পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার স্ববিরোধীতা ও সীমাব্ধতা।

বিশ্বের মোট জন সমষ্টির ৫০% এর কম সংখ্যক মানুষ কেবলমাত্র উৎপাদনী ক্রিয়া-কর্মে যুক্ত-জড়িত। পুঁজিপতি শ্রেণী , ও পুঁজিপতি শ্রেণীর সেবক নানান ধরণের নানান নেতা-শিক্ষক, রক্ষক- নানান বাহিনী, হুকুমের ভৃত্য নানান জাতীয় কর্তা, অধিকর্তা ও কর্মচারী ইত্যকার এক বিরাট লাট বহরের আরাম-আয়েশের বিলাসী জীবনের দায়-দায়িত্ব বহন করেও বিগত বছরে বিশ্বের মাথা প্রতি যে পরিমাণ গড় আয় হয়েছে তা সমানুপাতে বিলি বন্টন করা হলেও সম্পূর্ণটা ব্যয় করা যেত না । এতোটা মাত্রায় অতিরিক্ত পণ্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হওয়ায় যে পরিমাণ মজুত তৈরী হয়েছে তার চাপে-ভারে ভেংগে তছ-নছ হচ্ছে তামাম পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা। আর যদি উৎপাদনক্ষম সকলেই উৎপাদনী কাজে নিযুক্ত হতো এবং একজনও পরজীবী থাকার সুযোগ না থাকতো তবে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত অবস্থায়ই এখনই মাত্র দৈনিক ১ হতে দেড় ঘন্টা পরিশ্রম করলেই দুনিয়ার তাবৎ মানুষ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্য সম্মত উপকরণাদির ব্যবস্থা করতে সক্ষম অনায়াশে। অথচ, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী দৈনিক ৮,১০ বা ১০-১২ ঘন্টা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী কয়েকমাসে কেবলমাত্র সোমালিয়াতেই কয়েক লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করবে। এটি কেবল লজ্জা নয়, বরং পুঁজির আদিম-অকৃত্রিম বর্বরতা- জঘন্যতা, হিংস্রতা ও হত্যাকান্ড।

(১৯) ভূ-কম্পন, সুনামি, ঝড়-জলোচ্ছাস, তুষারপাত-বরফপাত, অগ্নি উৎপাত, ধাবানল ইত্যকার দুর্যোগপ্রবন অঞ্চল বা পাহাড়-পর্বত, বনাঞ্চল-জংগল, ও দুর্গম অঞ্চলে বসবাস করার অর্থ নিশ্চিতভাবে জীবনহানি সহ নানান দুর্ভোগের ঝুঁকি ও তদ্রুপ ঝুঁকির ভয়-ভীতি নিয়ে দিনাতিপাত। জীবন ধারণের উপকরণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ জীবনের জন্য হাজার হাজার বছর পূর্ব হতে মানুষ স্থানান্তরে গমনাগমন করছে। এখনো , নিরাপদ বসতির প্রয়োজনীয় এলাকা অকুলান নয়। অন্যদিকে, পৃথিবীর জনসংখ্যা ১বিলিয়ন থেকে হতে ২ বিলিয়ন হতে সময় নিয়েছিল ১১০ বছর অর্থাৎ -১৮২০ সালে লোক সংখ্যা ছিল ১ বিলিয়ন আর ১৯৩০ সালে ২ বিলিয়ন। কিন্তু, জুলাই-২০০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৬ বিলিয়ন এবং মাত্র ১১ বছরের মাথায় ২০১১ সালে জনসংখ্যা - ৭ বিলিয়ন। তন্মধ্যে এশিয়ায় এই সংখ্যা যেমন বেশী তেমন বৃদ্ধির হারও বেশী।
অত:পর, পরবর্তী পর্যায়ে ৮-৫ বা ৩ বছরের মাথায় যখন ১ বিলিয়ন করে মানুষ বাড়বে তখন কেবল শ্রমিক শ্রেণী নয়, ঘনবসতির দেশসহ দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনের পরিণতি কি হবে ? অথচ, ব্যক্তিমালিকানা বিলীন হলে এবং ব্যক্তিমালিকানা রক্ষা ও সংরক্ষণের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষক বিশ্বব্যাংক বা তাদের তল্পীবাহক সংস্থা-সংগঠন ইতাদি না থাকলে সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষ নিরাপদে বসবাসের জন্য পৃথিবীর সবচাইতে নিরাপদ স্থানকে সম্মিলিতভাবে চিহ্নিত করে সেই সকল স্থানকে সকলের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। তাছাড়া-কেনিয়াসহ আফ্রিকার দেশগুলি এবং বাংলাদেশ সহ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ সমেত পৃথিবীর বহুদেশের বহু মানুষ বাস করে বসবাসের অযোগ্য, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তি বা বস্তিতুল্য আবাসিক এলাকায়। শীত-বৃষ্টিতেও রেল-সড়কের পার্শ্বেও বসবাসকারী বা ঘুমানোর বা রাত্রিযাপনের মানুষের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়।

এমনকি খোদ আমেরিকার লুসিয়ানা রাজ্যে হালে প্রতি ১০ জনে ৪ জন বসতিহীন মানুষ রাস্তায় রাত্রি যাপন করে। স্বাস্থ্য রক্ষায় খাবার বা তাপানুকুল পোষাক-পরিচ্ছদতো নয়ই, এমনকি দুষিত-বিষাক্ত পানি ছাড়া মিষ্টি বা সুপেয় পানি পানের সুযোগও কেবলমাত্র ঐ সকল বস্তিবাসী বা ফুটপাতবাসীরই নয় জুটে না বটে অনেক ভদ্রগোছের বাড়ীর বাসিন্ধাদেরও। কলকাতা-ঢাকার মতো বহু জনবহুল নগরীতেই সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি কেবল দুষিতই নয়, ক্ষেত্রবিশেষ পানের অযোগ্য ও ভয়ানক ক্ষতিকর এবং বহু রোগব্যধির কারণ। অত:পর, পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল মানুষের নিরাপদ বসতি ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের সংস্থান করতেও যেমন অক্ষম-অযোগ্য এবং প্রতিবন্ধক তেমন সকলের জন্য প্রয়োজনীয় মিষ্টি বা সুপেয় পানির যোগান দিতেও অপরাগ। অথচ, এখনো মিষ্টি পানি অকুলান নয় ধরিত্রীতে। সুতরাং, বিশাল পরিমাণ পুঁজি মজুত থাকলেও এমনকি চাহিদা মতো মিষ্টি পানি যোগাতে অপরাগ পুঁজিতন্ত্র টিকে থাকার আদৌ আবশ্যকতা আছে কি? না এবং না।

(২০) সাম্য-মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ইত্যকার মুখরোচক বুলির আড়ালে কার্যত পুঁজির ব্যক্তিমালিকানা, অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ কেনাবেচার সামগ্রীক সুযোগ-সুবিধাদির পথ প্রশস্তকরণ করেছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। চার্চের কর্তৃত্ব হরণসহ মৃত্যুদন্ডের বিধানও রহিত করেছে পুঁজিপতি শ্রেণীই। গোত্র প্রথা বা মধ্যযুগীয় ভাবমানস ও ভাবাবেগ ইত্যাদি ধূলিসাৎ করে মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধকে নিতান্তই টাকার সম্পর্কে পরিণত করেছে পুঁজি। পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক শ্রমিক নিজেকে একক মানুষ হিসাবে চিনতে পারলেও সে একা যে কোনো পণ্য উৎপাদন যেমন করতে পারে না তেমন সমাজিক শ্রম ছাড়া যে পণ্য উৎপন্ন হয় না তাও প্রত্যক্ষ করলো। যতোই পুঁজিপতি শ্রেণী দাবী করুক পুঁজিতন্ত্রে সকলেই স্বাধীন কিন্তু কার্যত শ্রমিক তার পণ্য তথা শ্রম শক্তি বিক্রির দামাদামিতে দৃশ্যত স্বাধীন বা মুক্ত হলেও পুঁজিতন্ত্রী নিয়মেই স্থির হয় শ্রম শক্তির দাম তথা মজুরি এবং কার্যত শ্রমিক হচ্ছে মজুরি দাস, যে শ্রম শক্তি বিক্রি করা ছাড়া বাঁচতে পারে না। যদিচ, ভূমিদাসত্বের মতো সর্বক্ষণই নিয়োগকর্তার অধীন ও নিয়ন্ত্রণে থাকা নয়, বরং, শ্রম প্রদানকালীন কর্মসময় ব্যতীত বাকীটা সময় মজুরি দাস- শ্রমিক নিজের ইচ্ছামতোই কাটাতে পারে। আবার বৃহদায়তন শিল্পের যুগে উপনীত হয়ে ব্যক্তি পুঁজিপতির অপ্রয়োজনীয়তা ও ক্ষতিকরতা যেমন শ্রমিক শ্রেণী প্রত্যক্ষ করছে , তেমন পুঁজিপতি শ্রেণী ছাড়াই সামগ্রীক উৎপাদনী ক্রিয়া কলাপ ও সামাজিক কার্যাদি সম্মিলিতভাবে সম্পাদন যে অসম্ভব নয় তাও জেনেছে শ্রমিক শ্রেণী।

উপরন্ত, পুন:পন মন্দা-সংকটের পুন:পুন চক্রে আবর্তিত বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করে ক্রমান্বয়ে যৌথ ও সামাজিক মালিকানার যাবতীয় আঞ্জাম-আয়োজন করছে তাও প্রত্যক্ষ করছে শ্রমিক শ্রেণী। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের সাথে নিজেই শত্রুতা লিপ্ত হয়ে খোদ ব্যক্তিমালিকানার ক্ষতি সাধন করে পণ্য উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রমতো সামাজিক মালিকানার পথে ক্রমাগত ধবিত হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিনাশ সাধন করে শ্রেণীহীন সমাজের জমিন নিত্যই তৈরী করছে তাও নজর এড়ানোর সুযোগ নাই। কিন্তু, তাই বলে বুর্জোয়া শ্রেণী হাজারো স্ববিরোধীতা-বৈরীতা ও সীমাবদ্ধতা এবং হিংস্রতা ও

জঘন্যতা নিয়ে হলেও টিকে থাকতে চাইবে না তাতো হতে পারে না । তাই, একদা বিপ্লবী শ্রেণী বুর্জোয়ারাই স্বীয় শ্রেণী স্বার্থে ক্ষয়ে যাওয়া বিপন্ন ব্যক্তিমালিকানা রক্ষার অপচেষ্টায় ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরাতে গিয়ে পরিণত হয়েছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে। বিপরীতে বুর্জোয়া সমাজের অনিবার্য পরিণতি যেহেতু সামাজিক মালিকানার শ্রেণীহীন সমাজ এবং যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণীর আবশ্যকীয় সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদনী হাতিয়ারের মালিকানাহীন সেহেতু ব্যক্তিমালিকানা বিলোপের মাধ্যমে সাধারণ বা সামাজিক মালিকানার শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বীয় শ্রেণীর মুক্তি সহ সমগ্র মানবজাতির মুক্তি সাধনে একমাত্র উপযুক্ত ও যোগ্য হচ্ছে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী একাকী বিপ্লবী শ্রেণী। সুতরাং, ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় অপচেষ্টাকারী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত এর পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এটিও পুঁজিতন্ত্রের স্ববিরোধীতা ও স্ববৈরীতা।

(২১) পুঁজি গঠন, সঞ্চয়ন ও পুঞ্জিভবন চক্রে পণ্যের পুনরুৎপাদন-সঞ্চালন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিশ্বজয়ী পুঁজিতন্ত্র - মন্দা, সংকটে নিপতিত হয়ে যতোই সংকট-সমস্যা হতে উত্তরণ ঘটাতে হাজারো তান্ডব ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে শেষত বিশ্বব্যাংকের মতো বৈশ্বিক সংস্থা গঠন করেও পুঁজির জন্মদোষে দুষ্ট পুঁজিপতি শ্রেণী যতোই স্বীয় সংকট-সমস্যা হতে রেহাই পেতে চেয়েছে ততোই নতুন নতুন সংকট-সমস্যায় নিপতিত হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণী। অত:পর, একমাত্র বিনাশ ও বিলুপ্তি ব্যতীত বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে যে বুর্জোয়া সংকটের সমাধান সম্ভব নয়, তাও এখন সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। উপরন্ত , বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা-সীমাহীন নৈরাজ্যপনা, ভয়ানক দেওলিয়াপনা, চূড়ান্ত অক্ষমতা, মারাত্মক ক্ষতিকরতা, চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা, ক্রমবর্ধিত জবর-দস্তি ও স্বৈরতান্ত্রিকতা এবং সমাধান অযোগ্য ও মিমাংসার অতীত সংকট-সমস্যার সমাধান যে, কেবলমাত্র বুর্জোয়া সমাজেরই সৃষ্ট সংকট ও মন্দার অনিবার্য পরিণতি-সামাজিক মালিকালানার শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সাম্যতন্ত্রী সমাজ তাও প্রাকৃতিক নিয়মের মতো সামাজিক নিয়মেই যথার্থ -ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত। এই যৌক্তিক ও ন্যায্য ক্রিয়াটি সম্পাদনে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীগত সংহতি ও সংগঠন বিকল্পহীন শর্ত।

জাতীয় চৌহদ্দিতে বিকাশে অক্ষম পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী তাই বিশ্ব দখলকারী ও বৈশ্বিকভাবে আধিপত্যকারী; তাই পুঁজিতন্ত্রী সমাজ যেহেতু একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা, সেহেতু স্থানীয় বা জাতীয় গন্ডিতে এই ব্যবস্থার বিনাশ-বিলুপ্তি সম্ভব নয় অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাছাড়া, অতি উৎপাদনের সংকট বা মন্দাই যেহেতু সামাজিক মালিকানার ভিত্তিভূমি পাকাপোক্ত করে এবং মন্দাই যেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমোপস্থিত হেতুবাদ সেহেতু বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী ও নেতৃত্বকারী উন্নততর দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর সম্মিলিত ক্রিয়াদিই হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্তসমুহের মধ্যে প্রথমটি- এই রূপ মতামত কমিউনিস্ট ইস্তাহারে যথার্থভাবে বিবৃত হয়েছে। এবং আজকের যুগেও ইহা যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

বিশ্ব জয়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈশ্বিক ব্যবস্থা বিলোপে- শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গড়ার নিমিত্তে - কমিউনিস্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিবিংশ

শতাব্দীতে। তবে, দুনিয়ার শ্রমিকদের সুদৃঢ় ঐক্য-সংহতির অভাবে ও বুর্জোয়াদের দমন-পীড়ন ও ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে লীগ-সমিতি, দুটিই পরাজিত হয়েছিল । পরবর্তীতে বর্ণচোরা বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্য ১৮৯৬ সালে অপহরণ করেছিল ২য় আন্তর্জাতিক; আর লেনিন-ট্রটস্কিরা প্রতিষ্ঠা করেছিল তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিক-যা ছিল শ্রমিক শ্রেণীর দুশমন। তবে ঐতিহাসিক অপ্রয়োজনীয়তায় ঐ সকল কথিত ২য়,৩য় আন্তর্জাতিক ইত্যাদি বিলীন হয়েছে বুর্জোয়া সমাজের নিয়মেই।

অত:পর, দুনিয়ার পুঁজিপতিরা বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাকার নানান বৈশ্বিক সংস্থা ও সংস্থাদির সহযোগি নানান ধরণের সংগঠন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে কার্যত বুর্জোয়াদের যৌথমালিকানা ব্যবস্থার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। অত:পর, মরণাপন্ন বুর্জোয়া ব্যবস্থা রক্ষায় সৃষ্ট বুর্জোয়াদের উল্লেখিতরূপ বৈশ্বিক সংগঠন ইত্যাদি - শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি গড়ার আশু ও প্রত্যক্ষ ভুমি ও উপযুক্ত নজিরও সৃষ্টি করেছে এবং স্ববিরোধীভাবে তা করছে বটে বুর্জোয়া সমাজই।

সুতরাং- চিকিৎসার অযোগ্য মরণব্যধিতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত এবং তজ্জনিত কদাকারে পচাগলা-দুর্গন্ধময় বুর্জোয়া সমাজ বিলুপ্তি ও বিনাশে তথা ব্যক্তিমালিকানার অবসানের মাধ্যমে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণীগতভাবে গঠন এবং বুর্জোয়া আধিপত্যের অবসানে একটি কমিউনিস্ট বিল্পব সংঘটনে- বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিপ্লবী পার্টি তথা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা-প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা ক্রমেই প্রকাশ ও সামনে নিয়ে এসে গুরুত্ববাহী করে তুলছে পুঁজিতন্ত্রের বিদ্যমান স্ববিরোধতা ও স্ব-বৈরীতায় ক্ষত-বিক্ষত, বিধ্বস্ত-জর্জরিত ও জরাজীর্ণ পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অক্ষমতা-অযোগ্যতা, দুষণীয়তা-ক্ষতিকরতা, এবং স্ববৈরীতা ও স্ব-বিরোধীতাই।

কমিউনিস্ট পার্টি

(১) চিরাচরিত সম্পত্তি সম্পর্কের আমুল বিচ্ছেদ ঘটাতে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনে গঠিত বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

(২) এ যুগে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী একাই বিপ্লবী শ্রেণী এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী নিজেই নিজের মুক্তি অর্জন করবে। তাই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অর্জনে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনে ক্রিয়াশীল – কমিউনিস্ট পার্টি কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ।

(৩) বুর্জোয়া ব্যবস্থা যেহেতু একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণী যেহেতু বিশ্বের দখলদার সেহেতু সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে বুর্জোয়া সমাজ প্রতিস্থাপনে সংঘটিত কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে বৈশ্বিক; এবং বিশ্ব দখলকারী বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাতে দুনিয়ার শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই–সংগ্রাম করা ব্যতীত বিকল্প নাই বিধায় দুনিয়ার শ্রমিককে শ্রেণীগতভাবে গঠন ও ঐক্যবদ্ধকরণে– উপযুক্ত ও কার্যকর হাতিয়ার – কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি বৈশ্বিক পার্টি।

(৪) শ্রমিক যে যেখানে যে ক্রেতার নিকট শ্রম শক্তি বিক্রি করে সেই ক্রেতার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এ বিরোধ শুরু হয়ে শ্রম শক্তি বিক্রি করার সময় হতেই অর্থাৎ শ্রমিক হিসাবে জন্ম কাল হতেই। তাই জন্ম শর্তেই শ্রম শক্তির ক্রেতা– বিক্রেতা তথা শ্রমিক–পুঁজিপতির বৈরী সম্পর্কের হেতুবাদে শ্রমিক মাত্রই স্বীয় শ্রেণী স্বার্থে লড়াই করে নিজ নিজ শ্রম শক্তির ক্রেতার সাথে। সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার জাত–জাতি, ধর্ম–বর্ণ, লিংগ ইত্যকার পরিচিতি যেমন নিতান্তই অপ্রাসংগিক তেমন শ্রমিকেরও কেবলই শ্রমিক বৈ আর কোনো পরিচয় কেবল অর্থহীনই নয়, উপরন্ত ক্ষতিকর। তাই শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী মুক্তির পার্টি – কমিউনিস্ট পার্টি জাত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিংগ ইত্যকার সকল ভেদ–বিভাজনের জঞ্জালমুক্ত ও কালিমাহীন।

(৫) নিজ নিজ নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে সংঘটিত ও পরিচালিত সংগ্রাম আপাতদৃষ্টে আকার–আকৃতিতে স্থানীয় বা জাতীয় হলেও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিটি সংগ্রামই যেহেতু কার্যত পরিচালিত ও সংগঠিত হয় ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে তাই শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন–সংগ্রাম বস্তুতই ও প্রকৃতই আন্তর্জাতিক । তাই, পুঁজিতন্ত্রী শৃংখল ভেংগে শ্রেণী মুক্তির নিমিত্তে সমগ্র দুনিয়া জয় করার জন্য গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি –শুধুই আন্তর্জাতিকতাতন্ত্রী।

(৬) শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার শ্রেণী সচেতন, অগ্রসর ও লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তা সম্পন্ন অংশ–যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে এমন অংশ এবং শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য নয় , অথচ ইতিহাসের গতি–প্রকৃতি উপলব্ধি করে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী ধারা তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবের ধারার মধ্যে একীভূত হবে, এমন সকলকে নিয়ে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সাধারণ স্বার্থে সংগঠিত আন্দোলনকে বৈশ্বিক ভাবে সম্পৃক্ত–সংযুক্ত,সমন্বিত ও বেগবান করে এবং প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

প্রতিটি আন্দোলনকে সমর্থন করে সর্বাবস্থায় সর্বাগ্রে ব্যক্তিমালিকানার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে তাই কমিউনিস্ট পার্টি কেবল এবং একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বৈ আর অন্যকোন শ্রেণীর স্বার্থের পার্টি নয়। তবে, গ্রামের মজুররাও শ্রম শক্তির বিক্রেতা। তাই, মজুরি প্রথার অবসানে আধুনিক শিল্প কারখানার মতোই ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের মাধ্যমে সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠায় গ্রামীণ মজুরও আধুনিক শিল্প শ্রমিকের মিত্র। অত:পর, গ্রামীণ মজুরদের নতুন করে ভূমির শৃংখলে বন্দী নয়, বরং উৎপাদনের সকল হাতিয়ার তথা ভূমিরও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগঠনে- গ্রামীণ মজুরদেরও পার্টি বটে কমিউনিস্ট পাটি।

(৭) ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্তিতে সমাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট পার্টি- স্বকীয়তায় ও স্বক্রিয়তায় উপযুক্তভাবে কার্যকর হলে সামাজিক মালিকানার উপযুক্ত আধাঁর লাভকারী শ্রমিক শ্রেণী অতীতের সকল ভুয়া-ভ্রান্ত মততান্ত্রিকতা অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে ধনী বনে ভুয়া মুক্তি হাসিল ও কল্পিত নিরাপদ জীবন লাভ, বা লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজের মোহচ্ছন্নতা বা দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, ভাষাপ্রেম, লিংগপ্রেম ইত্যকার যাবতীয় বিষাক্ত প্রেমের ভয়ানক ক্ষতিকর বোধ-বুদ্ধি হতে মুক্ত হয়ে তুচ্ছ ও সংকীর্ণ ব্যক্তিমালিকানাজাত সকল চিন্তা-চেতনা হতে বিমুক্ত হয়ে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রমের উপযুক্ত বিষয়গত ভান্ডার তথা কমিউনিস্ট পার্টির কার্যধারার সাথে যেমন মিলিত হবে তেমন সামাজিক মুক্তির শর্তে শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে আশাপূর্ণ স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জীবনের স্বাদ-আনন্দলাভে বস্তুগতভাবেই আশান্বিত হবে। তাই, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান তাবৎ মততান্ত্রিক দুষণীয়তা দুরীকরণে যেমন কার্যকর তেমন অশ্রমিক হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্তে নিজ মুক্তি হাসিলের শর্তাধীন ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণের সকল ধরণের হতাশা-বিভ্রান্তি দুরীভূতকরণে কার্যকর ও উপযুক্ত সংগঠন হচ্ছে- কমিউনিস্ট পার্টি।

(৮) চিরন্তন সম্পত্তির মতোই চিরন্তন সব সত্য-নৈতিকতা, মতাদর্শ ইত্যাদির চিরবিলুপ্তি সাধন যেহেতু কমিউনিস্ট বিপ্লবের করণীয়। তাই কমিউনিস্ট বিপ্লব ও কমিউনিস্ট সমাজ ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। সুতরাং, কমিউনিস্ট সমাজে অতীতের কৃষ্টি-সংস্কৃতির চর্চার সুযোগ নাই।অর্থাৎ মানুষে মানুষে অসাম্য-বৈষম্য সৃষ্টিকারী বা তদানুরূপ সকল মুল্যবোধ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিমুক্ত মানবিক সমাজ হচ্ছে কমিউনিস্ট সমাজ। তাই- শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী স্বার্থে সৃষ্ট- লর্ড, মাষ্টার, হিরো, লিডার, টিচার, বুদ্ধিজীবী ইত্যকার ক্ষমতাধর-মহা প্রতিভাবান, মহামানব জতীয় পরজীবীদের মহা কেরামতির প্রশস্তি ও গুণ-কীর্তন বা মরণোত্তর সাংকীর্তন ইত্যাদি বা তদার্থে প্রচলিত প্রথা-রীতি বা তদনিমিত্তে চালুকৃত মুল্যবোধ জনিত আচার-আচরণ বা মানুষে মানুষে অসাম্য -বৈষম্য বজায়-বহাল রাখার যাবতীয় ঐতিহ্য ও নিয়ম-নীতি বা তদানুরূপ যাবতীয় মুল্যবোধ ইত্যাদি চর্চা বা পরিপোষণ কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে যেমন অচিন্তনীয়, তেমন অনুরূপ নানান পদ-পদবীদারী ব্যক্তিগণের অনুগত-বাধ্যগতরা সম মর্যাদার ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়নি বলে মানুষের সাথে মানুষের মর্যাদাগত তফাৎ-ফারাক সৃষ্টি বা তদার্থে সহায়ক সকল পদ-পদবী বিলীন ও তিরোহীকরণার্থে ক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট পার্টি যেমন লর্ড, মাষ্টার, হিরো, লিডার, টিচার, বুদ্ধিজীবী ইত্যকার

মহামানব জাতীয় পরগাছা মুক্ত, তেমন দাসত্ব বা অধীনতার পরিচায়ক পদ-পদবী মুক্ত । তাই, বসু, খান, চৌধুরি,ভূঞা,তালুকদার, চ্যাটার্জি , দাস, বিশ্বাস, মন্ডল, সরকার, কোঙার, নায়ার, কারাত, মুন্সি,মোল্লা, মল্লিক ইত্যকার যাবতীয় পদ-পদবীর জঞ্জাল-আবর্জনা বা তদানুরূপ ধারণা মুক্ত বলেই কেবলই সামাজিক মুক্তির শর্তে নিজ নিজ মুক্তি ও স্বাধীনতা হাসিলে ক্রিয়াশীল সমমর্যদা সম্পন্ন ব্যক্তির পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, সাম্যতন্ত্রের পরিপন্থী বা সাম্যবোধের সহিত বৈরী বা সাংঘর্ষিক চিন্তা-ধারণা ইত্যকার বোধ বা সাম্যতন্ত্রের প্রতিবন্ধক রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ও আচার-আচরণ মুক্ত পার্টি হচ্ছে - কমিউনিস্ট পার্টি।

(৯) সাংগঠনিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে হের-ফের হলেও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সকলেই সম মর্যাদাসম্পন্ন।

(১০) প্রত্যেক সদস্য পার্টির সকল বিষয়ে জানা ও মতামত প্রদানে সম সুযোগের অধিকারী। তাই সাম্যতান্ত্রিক নীতি-পদ্ধতি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার ভিত্তি। অর্থাৎ অধিকারহীন দায়িত্ব বা দায়িত্বহীন অধিকার যেমন কমিউনিস্ট পার্টিতে স্বীকৃত নয়, তেমন পার্টির প্রত্যেক সদস্যই পার্টির বিষয়ে মতামত প্রদানে যোগ্য ও উপযুক্ত এবং অধিকারী। তাই, পার্টির প্রত্যেক সদস্যই মতামত প্রদান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম মর্যাদা সম্পন্ন অর্থাৎ প্রত্যেকেই ১ ভোটের অধিকারী। পার্টির প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেকে প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে নির্বাচিত হতে অযোগ্য নয়। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতাই হচ্ছে পারস্পারিক সম্পর্কের মুল ভিত্তি। তাই, পার্টির প্রত্যেকে প্রত্যেকের বন্ধু। সুতরাং, বন্ধুত্বের উৎস, বন্ধুত্বের ভান্ডার, ও বন্ধুদের পার্টি - কমিউনিস্ট পার্টিতে সাধারণত কেউ কারো সাথে আলাপ-আলোচনায় বারিত নয়।

(১১) সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি -সর্বদা বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কারকে সাদরে গ্রহণ ও নবতর আবিস্কার ও গবেষণাকে সমর্থন ও উৎসাহিতকরণ এবং বিজ্ঞানের সার্বজনীনতাকে সার্বজনীনভাবে রূপায়নে সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে সক্রিয় । তাই, কমিউনিস্ট পার্টি- বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশে নির্ভয় ও নির্ভীক এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী ও সাহসী। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের পার্টি হচ্ছে-কমিউনিস্ট পার্টি।

(১২) প্যারী কমিউনকে দমন-নির্মূল করাসহ ব্যক্তিমালিকানা রক্ষা ও সংরক্ষায় বা পরস্পরকে দখল-বেখলে বা পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালন নিশ্চিতিতে অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণী পরস্পরকে খুন-জখম করা সহ তদনিমিত্তে আনবিক বোমা ব্যবহার করা সমেত অসংখ্য যুদ্ধ কওে আসছে । ২০১০ সালে সামরিক খাতে ১৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যায় বরাদ্ধ হলেও বিশ্বে সামরিক খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১.৬২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জনপ্রতি ২৩৬ মার্কিন ডলার। এককভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার হচ্ছে- ৪৩% এবং ১৫ টি রাষ্ট্রের শেয়ার হচ্ছে- ৮২%। ২০০১ সালের তুলনায় ২০০৯

সালে বিশ্বে সামরিকখাতে ব্যয় বেড়েছে- ৫০%। মানুষকে বাঁচানো নয়, বরং প্রয়োজনে মানুষকে হত্যা করে পুঁজি তথা ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় পুঁজিতন্ত্র অনুরূপ সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করছে বছর বছর।

অত:পর, শান্তিপূর্ণ পন্থায় বা বুর্জোয়াদের সংবিধানের আওতায় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দিবাস্বপ্নের বিষয় বটে। বস্তুত ও কার্যত এবং ঐতিহাসিক নিয়ম-নীতির সূত্র-তত্ত্ব মতো পরজীবী শ্রেণী কখনো অতীতেও নিজ শ্রেণী স্বার্থ বা সুযোগ-সুবিধা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়নি, তাই একালের পরজীবী বুর্জোয়া শ্রেণী যতো বিপদেই পড়ুক না কেন তারাও স্বেচ্ছায় বা কেবলই সংখ্যাধিক্যের মতামতের তোয়াক্কা করে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ পরিত্যাগ করবে তা হতে পারে না। অথবা, অমন নীরিহ ধরণের নির্গমনের জন্য পুঁজিতন্ত্র এত্তো বিশাল বহরের সেনাবাহিনী পোষণ সহ বিপুল ব্যয়ের সামরিক গবেষণা করতো না। তাছাড়া,

(ক) শূন্য ডিগ্রিতে বরফ ও ১০০ ডিগ্রিতে পানি বাস্প হয়। তাপ-চাপের হেরফেরে বরফ ও বাস্প হওয়ার ক্ষেত্রে পানির যদি শান্তি তথা স্থিতাবস্থা বজায় থাকার সুযোগ থাকে তবে অশান্তির বুর্জোয়া সমাজের শান্তি তথা অশান্তির স্থিতাবস্থা বজায় রেখে কথিত শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব;

(খ) জুলিয়াস সিজার ধর্মীয় পদ-পদবী দখলের নির্বাচনে ঘুষ দিয়েছিল । বর্তমান পুঁজিতন্ত্রী দুনিয়ায় কেবল ঘুষ-দুর্নীতি বা ভোট ক্রয়-বিক্রয় নয়, বরং খুন-খারাবী, সন্ত্রাস ইত্যাদি জলভাতের মতোই নির্বাচনী কার্যাবলীর অংশ;

(গ) পুঁজিতন্ত্রের বিলোপ তথা ব্যক্তি মালিকানার অবসান নয়, বরং বুর্জোয়া ব্যবস্থার সাধারণ স্বার্থ রক্ষা বা অনুরূপ স্বার্থের সাধারণ ব্যবস্থাপনা তথা সরকার পরিচালনায় বা সরকারী ক্ষমতা দখল বা করায়ত্তকরণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফল যদি সর্বাবস্থায় মেনে নিত প্রতিদ্বন্দ্বি বুর্জোয়া গোষ্ঠী তবে ১৯৭১ সালে যেমন বংলাদেশের জন্ম হতো না, তেমন ১৯১৭ সালের সংবিধান সভার ফলাফল লেনিন বাতিল করতে পারতো না বা তজ্জনিত কারণে রাশিয়ায় ১৯২৪ সাল তক গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হওয়াসহ দুনিয়ার নানান দেশে নির্বাচনী শর্তমূলে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল-বেদখলের শর্ত ভংগ ও অমান্য করা বা তদার্থে যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ হতো না। অথচ, নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিপ্লবপন্থীদের বক্তব্য মতো বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ তথা ব্যক্তিমালিকানার বিলুপ্তি মেনে নিবে তামাম বুর্জোয়ারা ! ???? ;

(ঘ) দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার নাই।তাই খোদ যুক্তরাষ্ট্র সহ বহুদেশেই সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ নাই;

(ঙ) বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধান সমর্থন, রক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে নির্বাহী বিভাগ শপথমূলে দায়বদ্ধ। অত:পর, নির্বাহী ক্ষমতা লাভে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, শান্তিবাদী-সমাজতন্ত্রীদের কথিত সমাজতন্ত্র নির্বাচনী ইস্যু হওয়ার সুযোগ নাই। তাই, বিদ্যমান পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বিশেষের সাংবিধানিক কর্তৃত্বমূলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বুর্জোয়া নেতৃত্ব নির্বাচিত হওয়া ছাড়া বিকল্প কিছু হওয়ার সুযোগ থাকার সুযোগহীনতায় কথিত বিশ্ব সমাজতন্ত্রীরা কস্মিণকালেও নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের শান্তিপূর্ণ ভোট বিপ্লবের সুযোগ পাবে না। উপরন্ত বুর্জোয়াদের

সংবিধানের আওতায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কথিত সমাজতন্ত্রীরা কার্যতই হয়েছে পড়েছে বুর্জোয়া সংবিধানের সমর্থক-রক্ষক ও নিরাপত্তা বিধানকারী; এবং

(চ)কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের একদম শেষ প্যারায় যেমন বর্ণিত এই: " The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win."

অত:পর, কমিউনিস্ট ইস্তাহার মুলেই ইস্তাহার রচনা কালে যেমন শান্তিপূর্ণ নয়, বরং প্রচলিত সমাজের সকল শর্তাদি কেবলই সবলে উচ্ছেদযোগ্য ছিল তেমন আজো। সুতরাং, যথার্থভাবে ভুল প্রমাণ না করে কমিউনিস্ট ইস্তাহার অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করাটা যেমন কমিউনিস্ট নীতি হতে পারে না তেমন নৈরাজ্য ও অশান্তির পুঁজিতন্ত্রকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিদায় করার মততন্ত্র ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টি দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও মুক্তি প্রত্যাশী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত করে বুর্জোয়া শ্রেণীর মহামন্দার দুর্যোগকালে বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্ট একটি মহাযুদ্ধকে সশস্ত্র জনগণের সম্মিলিত শক্তিতে মোকাবেলা ও পরাজিত করার মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমূলে উচ্ছেদ করে ব্যক্তিালিকানার চিরাবসান ঘটিয়ে বুর্জোয়া সমাজের স্থলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার অগ্রদুত। অত:পর, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দুনিয়া হতে যুদ্ধ ও যুদ্ধাসমেত সমরাস্ত্রকে ইতিহাসের যাদুঘরে পাঠানোর দায়িত্ববান পার্টি হচ্ছে-কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, বিশ্বময় অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল বলেই শান্তির ভান্ডার ও উৎস হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

(১৩) খুনা-খুনি, ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাস ইত্যকার তাবৎ দুস্কর্ম পরজীবীদের চরিত্র ও কর্ম। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী সকল পরজীবীতার অবসান ঘটাতে ঐতিহাসকিভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। তাই, মানুষের মার্যাদা প্রতিষ্ঠা করা বৈ মানুষের জীবনহানি বা সামান্যতম মর্যাদাহানী করার নীতি শ্রমিক শ্রেণীর নীতি নয়। দন্ড-শাস্তি ইত্যাকার বিষয়াদি সন্দেহাতীতভাবে মানুষের মানবিক মর্যাদার জন্য হানিকর। মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই মযাদাবান হিসাবে গণ্য না হওয়াটাই অমানবিক। কিন্তু, বুর্জোয়া শ্রেণী তা করতে সক্ষম নয় বলে বুর্জোয়া সমাজ অমানবিক হেতু সমাজতন্ত্র হচ্ছে মানবিক সমাজ। তবে, সামাজিক নিয়মে ক্রিয়াশীল বলেই নিজ নিজ ক্রিয়া-কলাপের জন্য ব্যক্তি বিশেষ নয়, মূলত দায়-দোষী বটে সমাজ। তাই অমানবিক বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ-বিনাশ ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষকে ব্যক্তিগত ভাবে হত্যা-খুন বা গুম করা হলেও শ্রেণীগত সম্পর্কের রদ-বদল হয় না তথা পুঁজিতান্ত্রিক শত্রুতা ও বৈরীতার অবসান হওয়ার সুযোগ নাই। কারণ, শত্রুতার কারণতো ব্যক্তি নয়, বরং পণ্য বেচাকেনার পুঁজিবাদী সমাজই এ শত্রুতার জন্মদাতা। কাজেই, পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিমালিকানা যতোক্ষণ থাকবে ততোক্ষণ ব্যক্তিমালিকানার শর্তাধীন শত্রুতা, বিরোধ ও বৈরীতা জন্মাবে ও থাকবে।

লক্ষ্যণীয়, বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া মাত্রই পুঁজির শর্তে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে; এবং পুঁজির অস্তিত্ব তথা ব্যক্তিমালিকানার প্রতিযোগিতার শর্তে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের মধ্যেও বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত হতে বাধ্য। তাই, পুঁজি তথা ব্যক্তিমালিকানার নিয়ম-শর্ত ও স্বত্বে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ক্রীয়াশীল এক ক্ষতিকর ও ক্ষয়কর শ্রেণী বটে। অত:পর, ইতিহাসের ক্রীড়নক হিসাবে বিরোধ-বৈরীতার ও শত্রুতার সামাজিক শর্ত বুর্জোয়ার ললাট লিখন। এ দু:সহ দুরাবস্থার দমবন্ধকরা পরিস্থিতির শিকার যেমন বুর্জোয়া নিজে তেমন তার জন্য উদ্ভুত ও সৃষ্ট সকল অমানবিক-লজ্জাস্কর যন্ত্রণার দায়ভোগী বটে শ্রমিক শ্রেণীও।তবে,অনুরূপ অমানবিকতা, লজ্জা, হিংসা সহ সকল দুস্কর্ম-দুর্নীতির হেতুবাদ ব্যক্তিমালিকানা যখন অপসারিত হবে তখন ব্যক্তিমালিকানার নিয়মজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নাই ব্যক্তি বিশেষের। অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রই মুক্তি লাভ করবে সামাজিক মুক্তির শর্তে। তাই, ব্যক্তি বিশেষ নয়, কার্যত ও প্রকৃতই ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতন্ত্রী সামাজিক ব্যবস্থাই যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রতিবন্ধক সেহেতু পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার অপসারণ- বিলোপই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্ত এবং বিকল্পহীন করণীয়। অত:পর, খতম বা ব্যক্তি হত্যার নীতি নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানার বুর্জোয়া সমাজ বিলুপ্ত ও বিলীন করাই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্তাধীন নীতি ; তাই বুর্জোয়া সমাজ বিলীনে বুর্জোয়া শ্রেণীকে কবরস্তকরণের ব্যক্তিমালিকানার অবসান বৈ ব্যক্তি হত্যা কমিউনিস্ট পার্টির নীতিও নয়, করণীয় বা কর্মও নয়। তদমর্মে প্যারী কমিউন উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বটে।

অত:পর, হত্যা, সন্ত্রাস, ভয়-ভীতি ইত্যকার হিংসাশ্রয়ী অপকর্ম ও দুস্কর্ম চিরতরে দুনিয়া হতে নির্বাসন বা তদানুরূপ ধারণাকেও চিরতরে বিদায় করার মাধ্যমে যতোটা সম্ভব মৃত্যুকে ঠেকিয়ে বা পরাজিত করার চলমান প্রক্রিয়ায় মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যের জীবন ও মর্যাদার পরিপূর্ণ নিশ্চিতি নিশ্চিতকরণার্থে ক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট পার্টি- হিংসামুক্ত ,দুশ্চিন্তা মুক্ত ও শান্তি প্রত্যাশী বা তদানুরূপ বোধ-বুদ্ধির উন্মেষ ও বিকাশে মানুষে মানুষে ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ ইত্যকার মানবিক গুণাবলীর ক্রমাগত পরিস্ফুটন ও পল্লবনে সক্রিয় । সুতরাং,খতম বা খুন-খারাবি ও সন্ত্রাস নয়, বরং মানুষের জীবন রক্ষা ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পার্টি হচ্ছে- কমিউনিস্ট পার্টি।

(১৪) ব্যক্তিমালিকানার সুযোগ-সুবিধা ভোগীরা নিজেদের পরজীবীতার স্বার্থে পত্তন করেছে- উত্তরাধিকার সমেত পরিবার, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব , রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র রক্ষক নানান বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠন। কিন্তু, ব্যক্তি মালিকানা না থাকলে ব্যক্তি মালিকানা রক্ষা ও সংরক্ষার সৃষ্ট তাবৎ প্রতিষ্ঠান-সংস্থার আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা বস্তুতই এবং ঐতিহাসিক নিয়মেই থাকে না। কাজেই, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবার -রাষ্ট্র ইত্যকার আপদ-জঞ্জালগুলো ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হবে। তদস্থলে সমাজের সকলের কার্যকর অংশগ্রহণে ও পরিকল্পনায় সামাজিক মালিকানার সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে এক বিশ্ব সমিতি। অত:পর, কমিউনিস্ট পার্টিও যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি, সেহেতু শ্রেণী বিলুপ্তকারী শ্রমিক শ্রেণী অপরাপর শ্রেণীর সাথে শ্রেণী হিসাবে নিজেরও বিলুপ্তি সাধনের মাধ্যমে নিজের মতোই সমগ্র মানবজাতির মুক্তি নিশ্চিতার্থে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্জন করবে তাতে- কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা নি:শেষিত হবে। সুতরাং, কমিউনিস্ট পার্টি বিলীন ও বিলুপ্ত হবে।

কমিউনিজম

(১) সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের মালিকানা ব্যক্তিগত- পুঁজিতন্ত্রী সমাজের এই স্ববিরোধীতার উপযুক্ত সমাধান- সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম।

(২) নৈরাজ্যিক উৎপাদনে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের ভারে নিপতিত পুঁজিতন্ত্রের পুন:পুন সংকটের পুন:পৌনিক মন্দার যথার্থ সমাধান- পরিকল্পিত উৎপাদনের সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম।

(৩) অতিমাত্রায় মজুত থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষের দারিদ্রতার কারণ- ব্যক্তিমালিকানার অবসানে সকলের জন্য প্রাচুর্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা- সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম।

(৪) পণ্যের বিক্রি সংকটের সমাধান পণ্য ব্রিকি প্রথার অবসানে সামাজিক চাহিদা মতো পরিকল্পিত উৎপাদন- এর সাধারণ মালিকানার সমাজতন্ত্র। তাই, সমাজতন্ত্রে বেচা-কেনা নাই। ফলে বেচা-কেনার জন্য অর্থ ইত্যাদির যেমন প্রয়োজন নাই, তেমন বেচা-কেনার নিমিত্তে ব্যবহৃত মুদ্রা ইত্যকার বিষয়াদির সহিত সম্পর্কিত ব্যাংক-বীমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যকার সকল বিষয়াদি অপসৃত হবে। অর্থাৎ কমিউনিজমে পণ্য অদৃশ্য হবে; তাই পুঁজির অন্তর্ধান ঘটবে। সুতরাং-পণ্যহীন, পুঁজিহীন সমাজই হচ্ছে কমিউনিজম।

(৫) পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত জন্মগত শর্তে বৈরীমূলক সম্পর্কে সম্পর্কিত শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধের একমাত্র ও যথার্থ সমাধান- মালিকহীন, শ্রমিকহীন তথা শ্রম শক্তি বেচা-কেনার সুযোগহীন সাধারণ মালিকানার কমিউনিজম। তাই,সমাজতন্ত্রে যেমন মজুরি ও মজুরি দাস নাই তেমন শ্রম শক্তির ক্রেতা মালিক বা পুঁজিপতিও নাই । সুতরাং সমাজতন্ত্র - শ্রেণীহীন সমাজ।

(৬) শ্রম বেচা-কেনার পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী পরজীবীতার সুযোগে সৃষ্ট সকল সামাজিক অনাচার ইত্যাদির অবসান- বেচা-কেনা হীন তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির সুযোগহীন- সাধারণ মালিকানার কমিউনিজম।

(৭) শ্রমই উৎপন্ন করে পণ্য। তবু, পুঁজিতন্ত্রী সমাজে শ্রমের গুরুত্বকে অস্বীকার-খাটো ও হীন গণ্যে শ্রমিক শ্রেণীকে নিন্দনীয় শ্রেণী সাব্যস্তে অশ্রমিক পুঁজিপতি শ্রেণীকে কৃত্রিম-ভুয়াভাবে অভিজাত ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রতিপন্নের পুঁজিতন্ত্রী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য- পণ্য উৎপাদন এর মধ্যেকার এদ্বিষয়ক বিরোধ-বৈরীতা ও স্ববিরোধীতার অবসান- সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম। তাই, শ্রমের বন্ধনমুক্তির সমাজ-কমিউনিজমে উৎপাদনী শ্রম আর কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্ম নয়, বরং সক্ষম সকল মানুষ পরিকল্পিত উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে শ্রম যথার্থভাবেই সার্বজনীনতা লাভ ও স্বমহিমায় স্বীয় গুরুত্বের স্বীকৃতি হাসিল করবে। তাই কমিউনিজমে শ্রম নিন্দুনীয় নয় । অত:পর, ব্যক্তিমালিকানা বিমুক্ত সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকেই শ্রম করা সত্ত্বেও কেউই শ্রমিক নয়, মানুষ। সুতরাং, মানুষের সমাজ হচ্ছে - সাম্যতন্ত্রী সমাজ ।

(৮) পরজীবীতার সূচনা হতেই পরজীবীদের সুযোগ-সুবিধা জায়েজীকরণ ও স্থায়ীকরণের নিমিত্তে তাবৎ পরজীবী মোড়ল-প্রভুরা নিজেদেরকে দেবতা, উপ-পাতি দেবতা সাজিয়ে নিজেদের চালাকি-চাতুরালী ও কৌশলাদিকে ঈশ্বর প্রদত্ত যোগ্যতা-মেধা হিসাবে জাহির করে দাস বা ভূমিদাস ইত্যকার শ্রমজীবীকে ঈশ্বরের কৃপাহীন , বেকুফ-বোকা, গর্দভ

ইত্যকার প্রাণী তুল্য জীব হিসাবে চিত্রিত ও শনাক্ত করেছে। দেব-দেবতা নামীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বই নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জায়েজ ও অক্ষুন্নকরণে নিজেদেরকে অভিজাত-বীর, প্রতিভাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী , শিক্ষক , নেতা ইত্যকার গণ্য-মান্য সাব্যস্তে শ্রমজীবীদেরকে কেবল কথিত গণ্য-মান্যদের অধীনে থাকাই নয়, বরং মানুষ মাত্রই জন্ম শর্তেই অপরাধী প্রতিপন্ন করে মানবজাতির কথিত আজন্ম অপরাধী স্বভাবজাত অপরাধী ক্রিয়াকর্ম বা দুস্কর্ম হতে মানুষকে ফেরাতে বা রক্ষা করতে বা তৎপ্রতিবিধানে কথিত উপযুক্ত ক্রিয়াদি সম্পাদনে তথা পূঁজন-ভজন, শিক্ষন, ও দন্ড বিধানে নিয়োজিত বুদ্ধিমানরা - নমস্য, পূঁজনীয়, শ্রদ্ধাভাজন, মাননীয় ও মান্যবর, গুরু, ব্রাহ্মণ, শিক্ষক, নেতা ইত্যকার নানান পদের তকমাদারী। উল্লেখ্য ঐ সকল পরজীবী ভন্ডদের মতে- দেবতারা মানুষ নয়, বা মানব কুলে জন্ম নিলেও , তারা হয় ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বরের অংশীদার বা ঈশ্বরের কৃপাধন্য এবং ঈশ্বর ও দেবতার প্রিয়পাত্র বটে বীর, প্রতিভাবান, গুরু, ব্রাহ্মণ, শিক্ষক, নেতা প্রমুখরাও।

পুঁজিপতি শ্রেণীও শোষণের ব্যবস্থা অটুট-অক্ষুন্নকরণে অতীতের বহুধরণের পরজীবীদের লালন-পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা সমেত আরো নতুন নতুন পেশার বুদ্ধিজীবী বানিয়ে-সাজিয়ে শ্রমজীবীকে কেবলই মুর্খ, অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও বুদ্ধিহীন এক মানবিক যন্ত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করছে। পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায়ও অতীতের মতোই বুদ্ধিজীবী নামীয় এসকল পরজীবীরাই, সন্মানীয়, মাননীয়, মান্যবর ও মর্যাদাবান জাতীয় নানান পদের তকমাধারী আর শ্রমজীবীরা অসন্মানীয়-অমর্যাদাবান। তাইতো কথিত মর্যাদাবানরা- মর্যাদাহীন শ্রমজীবী নিম্নবর্গীয়দের মতো- 'যারা', 'তারা' নয় , বরং চন্দ্র বিন্দু যোগে 'তাঁরা', 'যাঁরা' হউন বটে।

অতীতের মতো পুঁজিতন্ত্রেও নেতা-শিক্ষক ইত্যকার তাবৎ বুদ্ধিজীবী তথা পরজীবীদের পরজীবীতার যোগান দিতে হয় কথিত জ্ঞান-বুদ্ধিহীন শ্রমজীবীকে। ব্যাত্যয়ে অতীতের নরকবাস, কয়েদবাস, মৃত্যুদন্ড ইত্যকার নানান দন্ডের মতোই কিছুটা সংস্কার সাধন করে পুঁজিতন্ত্রেও নানান দন্ডাদির বিহীত করে বটে পরজীবীরাই।

অথচ, অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যা জ্ঞান হিসাবে শনাক্তকৃত, তা সহ বিদ্যমান সমাজের পারিপার্শ্বিকতা হতে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা লাভ করে। পুঁজিতন্ত্রী সমাজ এই অভিজ্ঞতার বিশ্বজনীন পরিবেশ তৈরী করে পুস্তকাদি সহ হাল আমলের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়া, নেট-মোবাইল ইত্যকার যন্ত্র ও প্রযুক্তি চালু ও কার্যকর করে সমগ্র দুনিয়ার সকল ব্যবহারীকে মানবজাতির সামগ্রীক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, মানুষের মস্তিষ্ক, যা চিন্তা করে তা আনুপাতিক হারে সমান। মস্তিষ্কের একদশমাংশ কেউ পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছে তেমন নজির এখনো নেই; তবে হবে। যেকোন উৎপাদনী ক্রিয়ায় বা মূল্য সৃষ্টিতে মস্তিষ্কের ক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তা এবং চিন্তার ভিত্তি অভিজ্ঞতা বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক ও কার্যকর। কাজেই, শ্রমে মস্তিষ্কের ব্যবহার সংযুক্ত। অত:পর, মস্তিষ্কের ক্রিয়া তথা মস্তিষ্কের হুকম-নির্দেশ ও নির্দেশনা ছাড়া দৈহিক অংগাদি স্বক্রিয়তায় অক্ষম ও অযোগ্য হওয়ায় কথিত দৈহিক ও মানসিক শ্রম এর ফারাক বা তফাত বিষয়ক বক্তব্য বানোয়াটি-অসত্য বৈ সত্য ও যথার্থ হওয়ার সুযোগ নাই। সুতরাং,শ্রমিক মাত্রই চিন্তাশীল, অভিজ্ঞ তথা তথ্য সমৃদ্ধ।

কাজেই, শ্রমিকরা চিন্তাশীল নয় বা জ্ঞানী নয় বা অশিক্ষিত-মুর্খ রূপ মতামত বা বক্তব্য তথা মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে তফাতকারী নিদান যেহেতু ভুয়া , অসত্য ও বানোয়াটি সেহেতু মানসিক শ্রমের কারবারী দাবীদার বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট এতদসংক্রান্ত সূত্র যেমন যথার্থ নয়, তেমন তাদেরই তৈরী -" অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারাখানা" প্রবাদটি বুদ্ধিবেচা বুদ্ধিজীবীদের মতো শয়তানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উপরন্ত, আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার সুবাদে শ্রমিক আধুনিক প্রযুক্তির তথ্য সমৃদ্ধ তথা অভিজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী না থাকার সুযোগ নাই। তাই, নেতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, শিক্ষক , বুদ্ধিজীবী ইত্যকার কোনো মান্যবরের আবশ্যকতা স্বয়ং সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর নাই, বরং শয়তানগুলিরই অনেক কিছু জানা-বুঝার আছে ইতিহাস ও শ্রমিক শ্রেণীর নিকট হতে। অত:পর, তথ্য বা অভিজ্ঞতা তথা জ্ঞান বিষয়ে পরজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যেকার বিরোধ-বৈরীতায় ভরপুর পুঁজিতন্ত্রী সমাজের স্ববিরোধীতার উপযুক্ত সমধান- পরজীবী মুক্ত কমিউনিজম। কাজেই, সমাজতন্ত্রে নেতা-গুরু, ব্রাহ্মণ-শিক্ষক, ইত্যকার সামাজিক জঞ্জাল-আবর্জনা ও আপদ-বিপদ তথা পরজীবী থাকার সুযোগ নাই এবং কেউ সেরকম নয়।তাই কমিউনিজমে সকলেই বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও তথ্য সমৃদ্ধ অর্থাৎ সকলেই জ্ঞানী।

প্রাক পুঁজিতন্ত্রী যুগে দু'য়েকজন ভন্ড-প্রতারক সবজান্তার ভান-ভনিতা করার সুযোগ পেলেও পুঁজিতন্ত্রে কার্যতই সেই সুযোগ নাই। তাই পুঁজিতন্ত্রী সমাজে কেউ নয় সবজান্তা বা সর্ব বিষয়ে বিশারদ। আবার প্রত্যেকেই কিছু না কিছু জানে। কিন্ত কেউই কেবলমাত্র নিজ নিজ জানা-বুঝার সীমিত পরিধির উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। তাই, প্রয়োজন হলেই অপরাপর জানা-বুঝা বা তদসম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের সাথে আবশ্যকীয় তথ্যের আদান-প্রদান করে। কাজেই, প্রত্যেকের জানা-বুঝার সীমাবদ্ধতা দুরীকরণে প্রত্যেকেই আন্ত:নির্ভরতার সম্পর্কাধীন। কাজেই সবজান্তা গুরু বা শিক্ষক যেমন পুঁজিতন্ত্রে ক্রমান্বয়ে নিস্প্রয়োজন হয়ে উঠছে তেমন গুরু-শিষ্যের আচার-আচরণ বা তদানুরূপ বোল-চাল ইত্যাদি কেবল দৃষ্টিকটুই নয়, বরং বেমানানও বটে নিদেনপক্ষে মর্যাদাবান ব্যক্তির ভদ্রতা ও মর্যাদার মানদন্ডে । যদিচ, শ্রীকৃষ্ণ, রাম, মনু, মুসা, টাও, জিউস, জুপিটার, ঈসাদের মতোই মহান শিক্ষক, ক্ষণজন্মা পুরুষ, বিরল প্রতিভাধর, চিরঞ্জীত বীর, ইটার্নাল চেয়ারম্যান,জাতি রক্ষক নেতা ইত্যকার তকমায় নিজেদেরকে সাজানোর অপচেষ্টাকারী বটে লেনিন, ষ্ট্যালিন, মাও, হোচি, কিম, টিটু, হোক্সা, চসেস্কু, ফিদেল, শেভেজ প্রমুখ একালীন বীর পংগুবরা।

স্বার্থান্ধতামূলে গুরুদের বানোয়াটি মতে-জন্মেই আজন্ম অপরাধী মানুষকে অপরাধী কর্ম হতে দুরে রাখতে বা অপরাধে উপযুক্ত দন্ড-শাস্তি বিধান এবং পূঁজন-ভজন ইত্যাকার পারলৌলিক ক্রিয়াদির মাধ্যমে দাস, দাস প্রভু সকলের সার্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিতিতে দেবতার অনুগ্রহে গুরুকুলে জন্মলাভকারী গুরুদের বিলাসী জীবন-যাপনের সামগ্রীক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য বটে অজ্ঞ, অপদার্থ ভক্তকুল দাসানুদাসদের। পুঁজিপতিরা পুঁজির স্বার্থে অমন আদি গুরু না হলেও নানান পেশার পরজীবী তথা বুদ্ধিজীবী বানিয়েছে অনেক । কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পর্যায়ে উপনীত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারাও পরিপোষণ-তোষণ ও লালন-পালন করছে বটে নানান সাধু-সন্যাসী ও গুরুজী বা সাঁইজি। অতীতের মাইথোলজিক্যাল কাল্ট- ভন্ডদের একালের রাজনৈতিক চরিত্রায়ন বটে লেনিন-মাও গং এন্ড কোং।

কিন্তু, সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই, প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য তথা অভিজ্ঞতা বিনিময় করে প্রত্যেকের তথ্য বিষয়ক সীমাধ্বতা দুরীকরণের মাধ্যমে নিজের অর্থাৎ প্রত্যেকের তথা সমাজের সামগ্রকি উন্নয়ন ও উন্নতিতে। অত:পর, সমাজতন্ত্রে- প্রত্যেকের জানা-বুঝার পরিসর কেবলই ক্রমবর্ধিতহারে বাড়াতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী-বন্ধু । তাই, সমাজতন্ত্রে - অতীতকালের গুরুজী, স্বামিজী বা একালের লেনিন- মাও ইত্যকার নেতা-শিক্ষক যেমন অকল্পনীয় তেমন পরজীবী সবজান্তা চরিত্রের

বুদ্ধিজীবী-গুরু ইত্যকার ব্যক্তি বিশেষ অচিন্তনীয় । কাজেই, সমাজতন্ত্রে - বীর, নেতা, গুরু, বুদ্ধিজীবী, প্রতিভাবান, শিক্ষক ইত্যকার তকমার পদ-পদবী যেমন অনুপস্থিত তেমন অমন তকমাযুক্ত ব্যক্তিহীন সমাজ হচ্ছে-সমাজতন্ত্র। অত:পর, ছাত্র-শিক্ষক, গুর-শিষ্য, নেতা ও নেতার অনুসারী ইত্যাদি পদ-পদবী যঁদ্বারা মানুষে মানুষে ছোট-বড়, উচু-নীচু, বৈরীতা-বৈষম্য প্রতিপন্ন ও উৎপন্ন হয় তা বিলীন ও বিলুপ্ত হবে। সুতরাং, মানুষে মানুষে নীচুতা-উচুতার জঘন্য ধারণা বিমুক্ত মানবিক সমাজ হচ্ছে- কমিউনিস্ট সমাজ ।

(৯) তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির প্রভূত বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন সত্ত্বেও পুঁজিতন্ত্রী সমাজের পরজীবীতার হেতুবাদে পূর্বাপর পরজীবীতার কারণে সৃষ্ট-লালিত ও পরিপোষিত অজ্ঞতা-অন্ধত্ব, মুর্খতা-মূঢ়তা, কুসংস্কার ইত্যকার ক্ষতিকর জঞ্জালগুলোর স্ববিরোধীতার যথার্থ সমাধান- সমাজতন্ত্রে পরজীবীতার সুযোগহীনতায় উল্লেখিতরূপ পরজীবী জঞ্জালগুলোর জন্মানোর সুযোগ নাই। তাই, সমাজতন্ত্রে সকল মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হেতু সমাজতন্ত্র হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার মানুষদের বৈজ্ঞানিক সমাজ। অত:পর, বৈজ্ঞানিক সমাজের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার মানুষগণ- প্রকৃতি ও মানুষ এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে দেখবে শ্রদ্ধা-ভাবাবেগমুক্ত দৃষ্টি ভংগি দ্বারা তথা খোলা চোখে খোলা ভাবে । তাই, সব কিছু খোলা চোখে খোলা-খোলি দেখার মানুষরা প্রত্যেকেই মুক্ত-স্বাধীন মানুষ। সুতরাং, সমাজতন্ত্র হচ্ছে মুক্ত -স্বাধীন মানুষের সমাজ।

(১০) পরজীবীতা মুক্ত সমাজে পরজীবীদের সৃষ্ট রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র সমেত রাষ্ট্র রক্ষায় সৃষ্ট আই.এম.এফ সহ নানান বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বহাল-বলবতে শত্রুপক্ষ-প্রতিপক্ষকে দমন-পীড়নে পরজীবীদের উদ্ভাবিত সেনা-পুলিশ সহ যাবতীয় দলন-পীড়নকারী সংস্থা-সংগঠন অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় । তাই রাষ্ট্র সহ ইত্যকার যাবতীয় রাজনৈতিক সংস্থা-সংগঠন বিহীন তথা রাজনীতি মুক্ত সমাজ হচ্ছে কমিউনিস্ট স্যোসাইটি।

(১১) রাষ্ট্র ও রাজনীতিহীন বলেই সমগ্র পৃথিবী রাজনৈতিক সীমানামুক্ত। তাই, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পৃথিবী প্রকৃতই জাত-জাতির ভেদাভেদহীন অর্থাৎ সকল মানুষের একটিমাত্র পৃথিবী হিসাবে সাব্যস্ত ও স্বীকৃত হবে। ফলে-পৃথিবীটাই যথার্থভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের সমানুপাতিক ভোগ-ব্যবহারের উপযুক্ত ও অবারিত স্থান হিসাবে বিবেচিত হবে সমাজতন্ত্রে।

(১২) যেহেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমগ্র পৃথিবীর মালিক দুনিয়ার সকল মানুষ তাই, নানান কারণে বিপন্ন-ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্গম অঞ্চলের পরিবর্তে আনুপাতিক হারে নিরাপদ স্থানে দুনিয়ার সকল মানুষ বসবাস করবে।

(১৩) সমাজতন্ত্রে যেহেতু পরজীবী নাই, সেহেতু পরজীবীতার জন্য সৃষ্ট নানান দপ্তর ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয়। ফলে- সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপে বা প্রাথমিক পর্যায়ে ইতো:পূর্বে পরজীবীতার নিমিত্তে ব্যবহৃত সকল ভবন ইত্যাদিকে বসতি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে। তবে,তুলনামূলক নিরাপদ স্থান চিহ্নিত হলে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রয়াশে সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় বসতি বিনির্মাণ খুব সময়সাপেক্ষ নয়। উপরন্ত বর্তমান আমলের মতো নয়, বরং বহু মানুষের একত্রে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে বসবাসের সুবিধা নিশ্চিতির বিষয় বিবেচনায় তদাপযোগি বহুতল ভবন ইত্যাদি নির্মাণের অত্যাধুনিক কলা-কৌশল ও প্রযুক্তি সহজেই করায়ত্ত হবে-সমাজতন্ত্রে।

(১৪) যেহেতু সমাজতন্ত্রে সমাজের একক হচ্ছে ব্যক্তি, সেইহেতু পরিবার বিমুক্ত তবে সার্বিক সহযোগিতার নীতিতে পরিচালিত সাম্যতন্ত্র বৈশ্বিক ব্যবস্থা তথা সমাজ বিধায় সমাজতন্ত্রে- জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত ও বিতরণ পদ্ধতিও যেমন সামাজিক রূপ লাভ করবে, তেমন খাদ্য উপকরণাদির উন্নয়ন ও উন্নতি সাধন সহ কেবলমাত্র সুস্বাস্থ্যের নিমিত্তে পানাহার নীতি

কার্যকরণে এসকল উপকরণাদির নিত্য-নতুন সংযোজন ও রূপান্তর এবং পরিবর্তন হবে এবং যথারীতি পরির্তন হবে খাদ্যাভ্যাসের।তাপানুকুল পোষাক-পরিচ্ছেদ, যোগাযোগ ও গতি সমেত পরিবহনের ক্ষেত্রে অভাবিত উন্নতি ও পরির্তন হবে সমাজতন্ত্রে। ফলে- রোগ-ব্যাধি যেমন ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে তেমন পরিবহন জনিত দুর্ঘটনা ক্রমেই নিম্নগামী হতে হতে শূন্য পর্যায়ের নিকটবর্তী হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

(১৫) পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উপকরণের পরিপোষণ ও বিস্ময়কর উন্নয়নকারী হয়েও বিজ্ঞানকে কেবলই পুঁজির স্বার্থে ব্যবহার করার মাধ্যমে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকে পুঁজির শৃংখলে বন্দী করে যেমন বিজ্ঞানের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তেমন বৈজ্ঞানিকতার অগ্রগতিতে ভয়ানক বাঁধা ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার স্ববিরোধীতার পরিণাম- সমাজতন্ত্রে, ব্যক্তিস্বার্থের শৃংখল মুক্ত বিজ্ঞান স্বীয় সক্ষমতা ব্যবহারে অবারিত সুযোগ পেয়ে অকল্পনীয় গতিতে এগিয়ে যাবে।

অত:পর, বৈজ্ঞানিক সমাজের সকল বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ সকল মানুষের সম্মিলিত ও সামগ্রীক লক্ষ্য হবে কেবলই মানুষের জীবন-যাত্রাকে উন্নততর হতে উন্নততর করা । সেজন্য মৃত্যুকে ঠেকিয়ে নিজ দেহ সহ প্রকৃতি বিজয়ে সদানিরত মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন বিষয়ে শ্রম শক্তি নিয়োগ করতে হবে খুবই স্বল্প পরিমাণ। তবে প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ সাধ্য মতো শ্রম করবে আর সমাজ থেকে নিবে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী। সুতরাং, জীবন ধারণের উপকরণের অভাব অচিন্তনীয় তথা দারিদ্রহীন, প্রাচুর্যময়, দুশ্চিন্তা মুক্ত ও অনাবিল শান্তির অনন্দপূর্ণ জীবনের সমাজতন্ত্র - প্রকৃতি জয়ী।

(১৬) পুঁজিতন্ত্রী সমাজে সামাজিক শ্রমে পণ্য উৎপন্ন হলেও এবং প্রত্যেকেই সমাজের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত কোনো ব্যক্তিই নিজ নিজ পুঁজি বা পণ্যের ভিত্তি ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে সমাজের উপর সরাসরি নির্ভর করে বাঁচার সুযোগহীনতায় ব্যক্তিকেন্দ্রীকতাই পুঁজিপতি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। অত:পর, ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা ও সামাজিকতার বিরোধ-বৈরীতা ও স্ববিরোধীতার উপযুক্ত ও একমাত্র সমাধান সমাজতন্ত্রে - প্রত্যেকেই সমাজের যেমন প্রত্যক্ষ অংশীদার তেমন প্রত্যেকে জীবন-যাপন ও উন্নয়নের জন্য সরাসরি নির্ভর করে সমাজের উপর। তাই সমাজতন্ত্রে - পুঁজিতন্ত্রী সমাজের মতো অভিভাবক বা উত্তরাধিকারের উপর পারস্পারিক নির্ভরতা ও অধীনতার যেমন প্রয়োজন নাই তেমন সুযোগও নাই। ফলে- পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার মতো কোনো ব্যক্তির নিজের ভবিষ্যত সুবিধাদির জন্য সন্তান জন্মদান ও সন্তানের ভবিষ্যত নিরাপত্তা বিধানে কার্যত ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্যোগ সমেত তদ্বিষয়ক দায়-দায়িত্ব সমাজতন্ত্রে অপ্রয়োজনীয় । বরং, জন্মাবদি প্রতিটি শিশুর লালন-পালন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি যোগানোসহ মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠার জন্য প্রত্যেক শিশুর সুযোগের সমতা সৃষ্টি করবে সমাজ। কাজেই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতন্ত্রে এডুকেয়ার তথা অভিজ্ঞতা বা তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থাও হবে একই মানের ও একই পদ্ধতির। স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রতিবেশ, সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কাদি এবং সমাজের সদস্য হিসাবে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব ও করণীয় ইত্যকার বিষয়াদি প্রাথমিকভাবে অবহিতকরণার্থে বা তদার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত অবহিতকরণই হবে এডুকেশন ব্যবস্থা তথা তথ্য বিনিময় ব্যবস্থার মুল নীতি। ফলে- জীবন ধারণের উপকরণ সহ

সমাজ-প্রকৃতি বিষয়ে অবহিত হওয়ার সুযোগের সমতার জন্যই প্রত্যেক শিশুই একই মান ও একই ধরণের সামাজিক-মানবিক বোধ সহ বেড়ে উঠবে। সুতরাং, সমাজতন্ত্র হচ্ছে একই মান ও বোধ সম্পন্ন মানুষের মানবিক সমাজ।

(১৭) অতীতের ধারাবাহিকতায় পুঁজিতন্ত্রীদেরও মতো সন্তান উৎপাদনের জন্য নারী দেহ সম্ভোগ নয় অথবা সুস্বাস্থ্য নয় বা সুস্বাস্থ্যের জন্যও নয় বা কেবলই আদিম উন্মত্ততায় তথাকথিত বিনোদন-ফূর্তি লুটার জন্য নয়, বরং সমাজতন্ত্রে পারস্পারিক ভালোবাসা, ভালো লাগার স্বেচ্ছা-সম্মতির ভিত্তিতে সুস্বাস্থ্যের জন্য মানুষের সাথে মানুষের মিলন হবে । তাছাড়া, ক্লোনিং, ষ্ট্যাম সেল, জিনগ্রাফি বা আর্টিফিসিয়াল লাইফ নির্মাণ ইত্যকার বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-কর্মে হাজারো বাঁধা-বিপত্তি সৃষ্টির বুর্জোয়া যুগের সীমাবদ্ধতা দুরীকরণে প্রতিস্থাপিত সাম্যতন্ত্রী সমাজ এই সকল বিষয় তথা প্রাণ ও প্রাণী বিষয়ক বিষয়াদিতে কি পরিমাণ উন্নয়ন-উন্নতি সাধন করবে তা কেবল অনুমেয়। কাজেই, নতুন মানুষ সৃষ্টির আদ্দিকালের ব্যবস্থাই যে সর্বকালেই অটুট ও অপরিবর্তিত থাকবে তাওতো হতে পারে না। ফলে- সাম্যতন্ত্রে সন্তান জন্মদানের কারখানা এবং পরুষের সম্ভোগের সমগ্রী বা রমনের সম্পত্তি বা দাসত্বের বৈবাহিক পেশা ও গৃহকর্মের মজুর হওয়ার দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত হবে নারী; এবং অসভ্য-বর্বর পুরুষালী বোধের জঘন্যতা ও লজ্জা হতে রেহাই পাবে পুরুষও। তাই, সমাজতন্ত্রে - বেহায়া, বেয়াড়া বজ্জাত পুরুষ যেমন নাই, তেমন লাজুক লতার লজ্জাবতী নারীও নাই। অত:পর, সমাজতান্ত্রিক সমাজে- জেন্ডার কেন্দ্রীক বিরোধ-বৈরীতা ও বৈষম্য থাকার সুযোগ নাই বলে জেন্ডার ভিত্তিক পরিচিতি নয় বরং সকলেই মানুষ এবং স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ। সুতরাং, প্রত্যেকের দেহ ও চিন্তার মুক্ত ও স্বাধীন ব্যবহারের সমাজ হচ্ছে- সমাজতন্ত্র।

(১৮) পুঁজিপতি শ্রেণী দুনিয়া দখল করে একদিকে দুনিয়ার পুঁজিপতিদের যৌথ মালিকানায় পুঁজিপতিদের সমাজতন্ত্র তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সহ কথিত বিশ্বায়নের নানান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়ার সকল জাতিকে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে আরো বেশীমাত্রায় আন্ত:নির্ভরতার নিবিড় ও গভীরতম সম্পর্কে সম্পর্কিত করে আন্ত র্জাতিক ব্যবস্থার দৃশ্যমান অবস্থা ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে; অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর জাতিগত চরিত্র-পরিচয় মুছে দিয়ে কেবলই শ্রম শক্তি বিক্রেতা হিসাবে কেবলই মজুরি দাস- শ্রমিক হিসাবে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকের একইরূপ স্বার্থের আওতায় সকল শ্রমিককে নিপতিত করে শ্রমিক শ্রেণীকেও স্বীয় শ্রেণী স্বার্থের উপযুক্ত বোধ তথা আন্ত র্জাতিকতাবোধের ভিত্তি প্রদান করছে- বুর্জোয়া শ্রেণীই ।

অথচ, পণ্যের বিক্রি ও পুঁজির সঞ্চলনের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনুকুল সুযোগ হাসিলে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে তার শ্রেণী চরিত্র ভুলাতে ও শ্রেণী স্বার্থ বিষয়ে বিভ্রম ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর দুরভিসন্ধিতে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ক্ষতিকর ভুয়া দেশপ্রেম, কৃত্রিম জাতীয়তাবোধের অন্ধ আবেগ এবং অসম্ভব জাতীয় মুক্তির কাল্পনিক মোহ ইত্যাদি বিস্ত ারে জোরালো কার্যক্রম চালিয়ে বুর্জোয়া বিশ্বায়নের সাথে জাতীয় মুক্তি-স্বাধীনতা ইত্যকার বিষয়াদির বৈরীতা, সামঞ্জস্যহীনতা, সাংঘর্ষিকতা ও বৈপরীত্যের ভয়ানক জট-জটিলতা ও সংকটে নিপতিত অন্ত:সার শূন্য বুর্জোয়া সমাজের স্ববিরোধীতার উপযুক্ত সমাধান- আন্তর্জাতিকতাবোধের ভিত্তিতে গঠিত মুক্ত বিশ্ব । অর্থাৎ রাজনীতি ও

রাষ্ট্রিক বাউন্ডারীমুক্ত, জাত-ধর্ম , বর্ণ- লিংগ ইত্যাদির ভেদ-বিভদ ও বিভাজন মুক্ত এক বিশ্ব , যার মালিক বিশ্বের সকল মানুষ ।

কাজেই মুক্ত মানুষের মুক্ত বিশ্ব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। অর্থাৎ এক বিশ্ব, এক জাতি তথা মানবজাতি এবং এক সমাজ তথা সমাজতন্ত্র। অত:পর, জাতিগত বিরোধ-বৈরীতার অবসানকারী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাত-জাতির পরিচয় নয় বরং দুনিয়ার মানুষ সকলেই পরিচিত হবে কেবলই মানুষ এবং মানুষ হিসাবে। সুতরাং, জাত-জাতি বিমুক্ত সমাজতন্ত্র হচ্ছে জাতিগত ঘৃণা-বিদ্বেষ বিমুক্ত সমাজ।

(১৯) সমাজতন্ত্র- বৈজ্ঞানিক সমাজ বলেই অবৈজ্ঞানিকতার ধারণাপুষ্ঠ বা বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যহীন বিষয়াদির অবসানে ক্রিয়াশীল। তাই, মহা বিশ্বের মিল্কিওয়ে, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদিসহ ধরিত্রীর বিভিন্ন স্থানের অবৈজ্ঞানিকতার যাবতীয় নামাকরণের আবশ্যকীয় সংশোধন ও আধুনিকায়ন সহ তদার্থে বৈজ্ঞানিক দিন পঞ্জি প্রস্তুত ও দৈহিক অংগাদির উপযুক্ত ও যথার্থ নামাকরণ করবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

(২০) ভাষার ক্ষেত্রে- শ্রেণী বৈরীতা-বৈষম্যের যাবতীয় শব্দ রদ-রহিত করে সাম্যতন্ত্রী সমাজের উপযুক্ত শব্দ সৃজন-উদ্ভাবন, তদার্থে ব্যাকরণ সমেত ভাষার সরলীকরণ, আধুনিকায়ন ও বৈজ্ঞানিকায়ন এবং বৈবর্তনিক প্রক্রিয়ায় দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য বোধগম্য সার্বজনীন একটি ভাষার উদ্ভাবন ও বিকাশ ঘটাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

(২১) সমাজের সকল সামাজিক ক্রিয়াদি সামাজিকভাবে সংঘটন, সংযুক্তরণ, সমন্বয় সাধন ও সমন্বিতকরণের নিমিত্তে সমাজের সকলের যথার্থ ও কার্যকর অংশ গ্রহণে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত - বিশ্ব সমিতি সমাজের সকল সামাজিক কাজ সুচারু ও সুপরিকল্পিভাবে সম্পাদনে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক স্থর বিন্যাস সহ যাবতীয় কর্মের খাতওয়ারী বিভাগ-শাখা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় সুযোগ সহ তদানুরূপ সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করবে- সমাজতন্ত্র। উক্ত বিশ্ব সমিতির সকল স্থরে ও সকল শাখায় যে কোনো ব্যক্তি প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য । কাজেই, সকল মানুষের সকল বিষয়ে কার্যকর অংশীদারীত্বের বৈশ্বিক ব্যবস্থা হচ্ছে-কমিউনিজম। সুতরাং,বৈষম্য-বৈরীতা মুক্ত শ্রেণীহীন সাম্যতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে প্রাচুর্য্য, সমসুযোগ, নিশ্চিতি, স্নেহ-প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, এবং অনাবিল শান্তি ও এক অখন্ড মানব জাতির সমাজ।

অত:পর, বস্তুর রূপান্তরণ- পরিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক নিয়ম তথা সামাজিক সম্পর্কের সহিত উৎপাদন শক্তির বিরোধে পুরনো সমাজের ধ্বংস ও উৎপাদন শক্তির উপযোগী নতুন সমাজ অপরিহার্য ও অনিবার্য ; এই সূত্রে- পণ্য উৎপাদন শক্তির পুন:পুন বিদ্রোহে পুন:পুন সংকটে নিমজ্জিত -পৌন:পুনিক মন্দায় আক্রান্ত -বিপর্যস্ত ও নিরাময় অযোগ্য মৃতবৎ পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ধ্বংস -বিনাশ ও বিলুপ্তি যেমন অনিবার্য তেমন সাম্যতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে মানবজাতির ভবিতব্য। সুতরাং, পুঁজি'র পরিণতি হচ্ছে-সমাজতন্ত্র তথা সাম্যতন্ত্র।

সমাপ্ত

Science Science and Science for Freedom
মুক্তির জন্য বিজ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

শ্রমিকের মুক্তির জন্য তথ্য কেন্দ্র
(স্থাপিত- ২৩ অক্টোবর,২০০৯)
সমাজতন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান, লেনিনবাদ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের করাপ্শন।
সুতরাং, মার্কস-এ্যাংগেলসের নিকট ফিরো।

Basic Concept & Rules

মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী

প্রস্তাবনা

সৌরজগত (পৃথিবীসহ) গঠিত হয়েছে তারকামন্ডলান্তর্গত ধূলিকনা ও গ্যাসের এক বিশাল ও ঘূর্ণায়মান মেঘ হতে যাকে পরিকীর্ণ বাস্পীয় পদার্থ বা নীহারিকা বলা হয়। সূর্য গঠনের উপজাত- নিস্প্রাণ পদার্থ হতে পৃথিবীর পানি ও জীবনের উদ্ভব হয়েছে। সৃষ্টির একটা নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মটি হচেছ বিজ্ঞান; প্রতিটি পরিবর্তন ও ক্রিয়ার কার্যকারণে একটা নিয়ম আছে, কাজেই প্রকৃতি, জীবনের নিয়মের মতোই সমাজেরও নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু শোষকরা শুধুমাত্র সম্পদ, পুজি ও ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে। তারা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিয়মকে তোয়াক্কা করে না উপরন্ত তারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিতে অবৈজ্ঞানিক সমাজ-রাজনীতিক মতবাদগুলো ব্যবহার করে আসছে। এমনকি, অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ এবং ব্যক্তিমালিকানার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণে তারা আজো সাফল্য লাভ করছে, যদিও শ্রমিকরা সকল মুল্য সৃষ্টি করে বলেই তারাই সকল সম্পওির মালিক। অথচ ব্যক্তিমালিকানা অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ যা শ্রমিকশ্রেণীর সকল সামাজিক দুর্দশা ও মানসিক অমর্যাদার কারণ সেই স্ববিরোধী ও চিরকালীন অনিশ্চয়তার সমাজের ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদেই শ্রম শক্তি বিক্রি করা ব্যতীত শ্রমিকশ্রেণীর কোন সম্পত্তি নাই।

পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক বিজ্ঞান শৃংখলিত, শ্রমিকশ্রেণী মজুরি দাস। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির উন্নয়ন তথা আবিস্কার, সৃষ্টি এবং উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় উৎপন্ন করা পুজিতন্ত্রের একটি চলমান প্রক্রিয়া। সুতরাং বিজ্ঞান ও পুঁজিতন্ত্রের মতোই পুজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বৈরীতামুলক সম্পর্ক বিদ্যমান। পুজিতন্ত্রের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবান হচ্ছে বিজ্ঞান এবং শ্রমিকশ্রেণীহীন পুজিপতি শুন্য। অথচ, পুজিপতি শ্রেণী ছাড়াই উৎপাদন সম্পন্নকরণে ও নিজেদেরকে অক্ষুন্ন রাখতে শ্রমিকশ্রেণী যথেষ্ঠ মাত্রায় সক্ষম। অত:পর, উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য বিজ্ঞান ও শ্রমিক শ্রেণী মিত্রোচিত শক্তি। এবং সমাজের জন্য পুঁজিপতি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর উপাদান। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্র-উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং শ্রমিক শেণীর শত্রু ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগ পরিত্যাগ ও বাতিল করার জন্য শ্রমিক শ্রেণী এবং বিজ্ঞানের ঐক্য একান্ত অপরিহার্য। উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন করে শ্রমিকশ্রেণী অথচ তা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতিশ্রেণী, কাজেই পুঁজি হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের অপরিশোধিত অংশ বা অদেয় মজুরি। অত:পর, পুঁজিপতি হচেছ শোষক, প্রতারক, দুর্নীতিবাজ এবং সর্বোপরি অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচেছ অবৈজ্ঞানিক, অন্যায্য, অপরাধ স্রষ্টা, অপরাধ নির্ভর, অপরাধ রক্ষক, জঘন্য, ভয়ংকর ও অনিশ্চিত, যুদ্ধ প্রবন এবং শ্রম, সৃষ্টি, অগ্রগতি, আধুনিকতা, সমতা, শান্তি, মুক্তি এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজের বিরোধী। অত:পর, বিজ্ঞান, সমাজ, শ্রমিক শ্রেণী এবং মানুষেরও মুক্তি নিশ্চিতিতে পুজিতন্ত্রের বিনাশ আবশ্যকীয়। সুতরাং, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের মাধ্যমে অর্থাৎ পুঁজি পুঞ্জিভূত করার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস এবং শ্রেণী ও রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র রক্ষক বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত বা রাষ্ট্র রক্ষায় নিয়োজিত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলুপ্ত করে অসভ্য, অবৈজ্ঞানিক, এবং অমানবিক পুজিতন্ত্রকে বিলীন করা জরুরী। অনুরূপ বিলুপ্তিকরণ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিযুক্ত, যথার্থ ও ন্যায়সংগত, কারণ-

(১) ১৩.৭৩ বিলিয়ন বৎসর বয়সী মহা বিশ্বের আধার হচ্ছে কমপক্ষে ৯৩ বিলিয়ন আলোক বর্ষ। ২০০৮ সালে মহা বিশ্ব হচ্ছে: ডার্ক এনার্জি-৭২%, ডার্ক ম্যাটার-২৩%, রেগুলার ম্যাটার-৪.৬% এবং নিউট্রিয়নস ১% এর নীচে। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে ১০মিলিয়ন হতে ১ ট্রিলিয়ন ষ্টার আছে এবং দৃশ্যমান মহা বিশ্বে ১০০ বিলিয়নেরও বেশী গ্যালাক্সী আছে। বেশীর ভাগ তারার বয়স ১ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন বছর এবং সৌরজগতের প্রতিবেশী পরিচিত সকল তারার ৬% সাদা ক্ষুদ্রাকৃতির যা কালো ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিণত হয়ে খুবই ঠান্ডা হওয়ায় অর্থপূর্ণ তাপ ও আলো নির্গত করতে পারছে না। এবং ৪.৫৭ বিলিয়ন বছর বয়সী তারা অর্থাৎ সূর্য যা পৃথীবির প্রায় সকল শক্তির উৎস সেটিরও ৫.৩৩ বিলিয়ন বছর পরে অস্থিত্ব থাকবে না;

(২) এটমে আছে ঋণাত্মক শক্তির ইলেক্ট্রনিকস ও ধনাত্মক শক্তির প্রোটনস এবং ইলেক্ট্রিক নিউট্রনস। সেজন্য সেখানে ইলেক্ট্রোম্যাগনিটিজম বিদ্যমান বলেই এটমের অভ্যান্তরীণ সম্পর্ক হচ্ছে বৈপরীত্যের ঐক্য অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক। সে কারণেই প্রতিটি বস্তু গতিশীল, পরিবর্তনশীল এবং রূপান্তরশীল;

(৩) পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বৈরীতামূলক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক নিয়মের অধীন; এবং

(৪) রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, শ্রেণী এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস হচ্ছে মাত্র প্রায় ৫৫০০ বছরের কিন্তু মানুষের ইতিহাস হচ্ছে প্রায় ২০০,০০০ বছরের, কাজেই রাজনীতি, শ্রেণী এবং রাষ্ট্র এক সময়ে ছিল না; এখন রাষ্ট্র মৃতবৎ এবং পুঁজিতন্ত্রের সাথে সমাধিপাড়ে উপনীত। অতএব, রাষ্ট্র এবং পুজিতন্ত্র উভয়ই উন্নয়ন ও সমাজের জঞ্জাল ও বোঝা, এবং মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক।

কেবলমাত্র রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজ। বৈজ্ঞানিক সমাজে সকল প্রকার অবৈজ্ঞানিক মতবাদ, দৃষ্টিভংগি এবং চিন্তা তিরোহীত হবে, এমনকি পুজিতন্ত্রী ধারণা অর্থাৎ ভুয়ামি, বানোয়াটি, ভন্ডামি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ইত্যকার বিষয়াদি অতিতের অংশে পরিণত হবে এবং অস্ত্রাগার ও সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ঠাঁই নিবে ঐতিহাসিক যাদুঘরে, অতএব, ঐটি হচ্ছে প্রাচুর্য সমেত চিরন্তর শান্তির শান্তি পূর্ণ সমাজ যার মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে প্রকৃতিকে জয় করতে প্রত্যেকের সর্বোচচ সামর্থ ও ক্ষমতা ব্যবহারে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেক্যের সহযোগিতা।সুতরাং বিজ্ঞানের সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণী এবং যথার্থভাবে মানব সমাজও মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করবে এবং হবে প্রকৃতির প্রভু । অনুরূপ বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞান ও শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি একান্ত আবশ্যক। অতএব, বিজ্ঞান ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় একটি "বিশ্ব তথ্য সংগঠন" অতীব গুরত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

এই লক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে Information Centre for Workers Freedom প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ইহা ১৯৮১ সালে জগতপুরে প্রতিষ্ঠিত গণ উন্নয়ন পাঠাগারের রূপান্তর।

অতএব ICWF এর মটো হচ্ছে বিজ্ঞান জানা, বিজ্ঞান অনুশীলন করা এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য কাজ করা।

সুতরাং, ICWF এর মুল শ্লোগান হচ্ছে-মুক্তির জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান।

১.উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা ও সহায়তা করা।

২.ঘোষণা এবং পক্ষপাতিত্ব :

(ক) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস কর্তৃক উদ্ঘাটিত-সুত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান।

(খ) লেনিনবাদ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা, বিচ্যুতি, বিকৃতি ও দুষণ।

(গ) পীড়িত বুর্জোয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সমর্থনে এবং তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়াদের মুক্তি সাধনে এক দেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও ভুয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা যার ভিত্তি হচ্ছে দ্বিতীয় আন্ত র্জাতিকের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভুয়া-বানোয়াটী সুত্র তা কার্যকরণে নিয়োজিত ছিল লেনিনের পার্টি। যদিচ, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার অনুযায়ী-

"কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, তারা জাতীয়তা ও দেশগুলি তুলে দিতে চায়। মেহনতি মানুষদের কোন দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, দেশের পরিচালক শ্রেণীর পদে উন্নীত হতে হবে, নিজকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে, তাই সেদিক থেকে বলতে গেলে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতীয়, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়। " এবং" এই অর্থে কমিউনিষ্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে: ব্যক্তিগত মালিকানার উচেছদ।" এবং "বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের

লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে হল প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মেটাতে হবে নিজেদের বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে।"

কিন্তু লেনিন ও লেনিনবাদীরা জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে এবং সে কারণেই তারা জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম এবং চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রিয় পুজিতন্ত্রের পক্ষে। যদিও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার সহিত বৈরী সম্পর্কাধীন জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি মেকি বুর্জোয়া ধারণা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রেম হচ্ছে দেশপ্রেম যা শোষকদের অসৎ উদ্দেশ্যজাত রাজনৈতিক স্বার্থে এক বানোয়াটি কৃত্রিম আবেগ এবং নি:সন্দেহে রাষ্ট্রিয় পুজিতন্ত্র হচ্ছে পুজিতন্ত্রই।

লেনিনবাদী পার্টি ও লেনিনীয় রাষ্ট্রের ঘোষণামতে লর্ড লেনিন এবং লেনিনীয় লর্ডরা কল্পকথার বীরদের মতো 'মেধাবী ও প্রতিভাবান', 'মহান শিক্ষক', 'মহান নেতা', 'মহান মুক্তিদাতা', 'জাতির রক্ষক', এবং ' চিরঞ্জীত'। লেনিন ও লেনিনীয় কিংরা কিছুটামাত্রায় মিশরের ফারাও ডাইনেষ্টীর সম্রাটের অনুসারী এবং লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার তাত্ত্বিক ধারণার দার্শনগত ভিত্তি হচ্ছে বুক অব পিরামিড। এবং কিং ফারাও ও কিং রোমেলাসের মতোই লেনিন ও অন্যান্য লেনিনবাদীরা তাদের নিজস্ব পার্সোনাল কাল্ট সৃষ্টি ও পরিপোষণ করেছে। লেনিনবাদী ও লেনিনের রাজত্ব হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতে উৎপাদনী উপকরণের একচেটিয়াকরণের পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র।

উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকরণে রাষ্ট্রিয় পুঁজিতন্ত্রের একটি রাষ্ট-যে রাষ্ট্রটি পার্সোনাল কাল্ট সংরক্ষক সেনা শক্তি তথা পুলিশ, বিশেষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর আধিপত্যে এবং রাজনৈতিক এলিট সমেত লেনিন বা লেনিনবাদী লর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেই রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজতন্ত্র: তথাকথিত সমাজতন্ত্রের এমন বানোয়াটি সুত্র স্বয়ং লেনিন সুত্রায়িত করেছেন। এমনকি, এমন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মিত ও টিকে থাকবে যদি তা প্রতিবেশী পুজিতন্ত্রী রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত না হয় বা বিদেশী সাহায্য ও পুজি পায় এবং উচ্চতর বেতন ও ঘুষের বিনিময়ে সাবেক আমলাদের সহযোগিতায় । সুতরাং কার্ল মার্কস ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির মতানুযায়ী লেনিন এবং লেনিনবাদী ট্রটস্কী, ষ্টালিন, মাও, হো-চিমিন, হোক্সা, চসেস্কো, টিটো, কিম, ক্রুচেভ, গর্বাচেভ এবং অন্যান্য লেনিনবাদী-মাওবাদী রাষ্ট্রীক নির্বাহী ও পার্টি লর্ডরা হচ্ছে অপরাধী চক্র; এবং তাঁদের অুনসারী অথচ সুবিধাভোগী নয় এমনরা হচ্ছে বেকুফ ।

(ঘ) লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন, মাও এবং অন্যান্য সকল লেনিনবাদী-মাওবাদী কোম্পানীগুলো হচেছ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ও কবরপাড়ে উপনীত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের বন্ধু এবং রক্ষক ।

(ঙ) সমাজতন্ত্র রাজনীতির প্রশ্ন বিষয় নয়, কিন্তু ইহা একটা সামাজিক প্রসংগ। সুতরাং সমাজতন্ত্রী হচেছ সমাজ কর্মী।

(চ) সাম্যতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র । তাই পুঁজিতন্ত্রের বিলুপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত সাম্যতন্ত্র হচ্ছে একটি নতুন সমাজ। যেখানে ব্যক্তিমালিকানা নাই, বেচা-কেনা নাই, উদ্বৃত্ত-মুল্য নাই, পুঁজি নাই, শোষণ নাই, কাজেই শ্রেণী নাই; অত:পর, শ্রেণী স্বার্থের জন্য কোনো রাষ্ট্র নাই। সুতরাং, সমাজতন্ত্র হচেছ রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজ।

(ছ) সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক কাজ হচেছ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমেত সকল প্রকার উত্তরাধিকার বিলোপ এবং সম্পদের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে যে কারো উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগ বিলুপ্তি এবং সাধারণ সম্পত্তি হবে পরিকল্পিত ও যথোচিত উৎপাদন ও বন্টন সমেত বিশ্বের নিরাপদ অঞ্চলে জনবসতির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য ও বৈজ্ঞানিক জীবন ব্যবস্থার নিমিত্তে বাসস্থান, খাদ্য, পরিধেয় এবং অন্যান্য মৌলিক উপকরণাদি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিহীতাদি এবং মানব দেহ গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয় অথচ পরজীবীতার হীন স্বার্থে দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতির তারতম্য প্রকাশক অংগ বিশেষকে মুল্য উৎপন্ন সমেত কর্মক্ষমতার তারতম্য নির্ধারক গণ্যে কেবলই অংগ বিশেষের হেতুবাদে অধিকতর কর্মক্ষমতাবান ও কম কর্মক্ষমতাবান ব্যক্তিতে ভাগ-বিভাজনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বৈষম্য-বৈরীতা সৃষ্টি করে কেবলমাত্র অংগ বিশেষের পরিচয়ে পরিচিতকরণের জেন্ডারের ঘৃণ্য ও বর্বর ধারণার বিলোপ এবং বৈজ্ঞানিক মুল্যায়ন ও বৈজ্ঞানিক বৈবর্তনিক প্রক্রিয়ায় একটি সহজ ও একক ভাষা উদ্ভাবন এবং কল্পকথা ও অবৈজ্ঞানিক শব্দ বা দাস-প্রভু সম্পর্ক বোধক বা তদার্থের শব্দরাজি অথবা আধিপত্য, অধীনতা ও মানুষকে বিভাজিত করার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বিনাশ,বিলোপ ও পরিত্যাগ এবং বস্তুবিশেষ শনাক্তরণ অর্থাৎ বস্তুর যথাযথ, উপযুক্ত ও যথোচিত বর্ণনা ও কার্যাবলী তথা সংজ্ঞা অথবা প্রকৃত ও নির্ভুল গতি অথবা সুনির্দিষ্ট অস্থিত্ব বা যেকোন ঘটনা ও সংখ্যার যথোচিত শব্দরাজি উদ্ভাবন ও উদ্ঘাটন এবং বৈষম্য ও বৈরীতামুক্ত মানবিক সম্পর্কের

উপযুক্ত ও যথার্থ নতুন শব্দরাজি পরিগ্রহণ করার জন্য ব্যাকরণের পরিবর্তন ও হালনাগাদিকরণ এবং পার্সোনাল কাল্ট বা অবৈজ্ঞানিক ঘটনার প্রতিনিধিত্বকারী স্থানসমূহের পুন:নামাকরণ এবং গ্যালাক্সি বা মিল্কিওয়ে এবং গ্রহের মতোই কল্প কথার নামযুক্ত মাস ও দিনের নাম বিলোপ সাধনের মাধ্যমে বর্ষপুঞ্জির সংস্কার সাধন করা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আশু লক্ষ্য।

(জ) সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র নয়,বরং রাষ্ট্রীয় সীমানাহীন বৈশ্বিক সমাজ; যা পরিচালিত হবে একটি বিশ্ব জনসমিতি দ্বারা।

(ঝ) সমাজতন্ত্র অর্থাৎ শ্রমিকের মুক্তি, স্থানীয় বা জাতীয় কোন বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে নির্ভর করতে হবে আধুনিক সমাজের অগ্রগামী দেশগুলোর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐকমত্যের উপর।

(ঞ) কোন জাতীয় সংগঠন কিংবা কোন রাজনৈতিক দল নয় বরং শ্রেণীহীন সমাজের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিশ্ব সমিতি আবশ্যক যা সমাজতন্ত্রের মৌলিক হাতিয়ার, অগ্রদূত ও সাংগঠনিক শর্ত।

(ট) এফ.ডি. রোজভেল্ট, ডবিউ.চার্চিল এবং জে. ষ্টালিন কর্তৃক সৃষ্ট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ হচ্ছে বিশ্ব প্রভু, রক্ষক, সংরক্ষক এবং পুঁজিবাদের মতো রাষ্ট্রেরও শাসক। সুতরাং, ব্যক্তিমালিকানার পক্ষীয় সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলো সমেত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের ধ্বংস, বিনাশ, বর্জন ও বিলোপসাধন করা সমাজতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

(ঠ) পুজি যৌথ উৎপন্ন সুতরাং পুজি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয় সামাজিক কিন্ত পুঁজি ও মজুরি শ্রমের বৈরীতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদে পুজির মালিকানা হচ্ছে ব্যক্তিগত । সুতরাং পুঁজিবাদী সম্পর্ক হচ্ছে বৈষম্যমূলক, সাংঘর্ষিক ও বৈরীতামূলক। উপরন্ত, পুজিবাদী উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজির পুঞ্জিভূবন। অতএব, অনিবার্যভাবে অতিরিক্ত বা বেশী উৎপাদন পুজিবাদের প্রকৃতি এবং এটি হচ্ছে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ যাকে বলা হয় পুঁজিবাদের সংকট। সংকট শ্রমিক শ্রেণীকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং অতি দ্রুত অনেক পুজিপতিকে শ্রেণীচ্যুত করে। পুঁজিবাদী সংকটের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য এবং এটি পুজিবাদী সমাজের নিরাময় অযোগ্য জন্মগত ব্যাধী বলেই পুজিবাদের সংকট সমাধান অসম্ভব। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজ উৎপন্ন করে অধিক হতে অধিকতর ধ্বংসাত্মক শক্তি যেমন পুঁজিবাদের নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণ এবং শ্রমিকশ্রেণী। সুতরাং, মিত্রোচিত উভয় শক্তির সাধারণ স্বার্থ হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীকে কবরস্তকরণে চিরতরের জন্য উৎচ্ছেদ করা। অত:পর, সাফল্যের সহিত পুজিবাদের সংকট উত্তরণে বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও যৌথ উৎপাদনের জন্য মানানসই ও যথার্থ একটি নতুন সমাজ যা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তির জন্য বিদ্রোহী উৎপাদন উপকরণের সহিত উপযুক্ত, যথার্থ ও ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্রমিকশ্রেণী অবৈজ্ঞানিক পুঁজিবাদী সমাজ বিলুপ্ত ও বিলীন করবে এবং সে কারণেই পুরনো পুঁজিবাদী সমাজ টিকবে না।

(ড) সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদের স্থলাভিষিক্তিকরণে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীকে বিজয় অর্জন করতে হবে ; এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির কাজ শ্রমিক শ্রেণীর নিজেরই ; এবং

(ঢ) শ্রমিকদের মুক্তির মৌলিক প্রয়োজন ও মৌল শর্ত হচ্ছে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি এবং প্রণালীবদ্ধ ঐক্য।

সুতরাং, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সমিতি গঠনে উদ্যোগ নিতে ও সহযোগিতা করতে Information Centre for Workers Freedom প্রাসংগিক তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং সমগ্র দুনিয়ায় আদান-প্রদান করবে।

৩। **সাংগঠনিক নীতিমালা**

(ক) কেবলমাত্র সাম্যতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রী সম্পর্ক;

(খ) সকল সদস্য সমান;

(গ) প্রত্যেক সদস্যেরই অধিকার আছে জানা, কাজ করা,প্রত্যাহার সাপেক্ষ যে কোন পদে নির্বাচন এবং ভোট প্রদান করার এবং নিজস্ব সাংগঠনিক স্তরে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মুক্তমনে ও খোলাখুলিভাবে মতামত প্রদান এবং পদত্যাগের অধিকার সহ একটি বা বিভিন্ন ইউনিটে একাধিক পদ ধারণে কেউ বারিত হইবেন না;

(ঘ) প্রাক সভ্য ICWF এর সদস্য নন এবং প্রাক সভ্য ফোরাম সাংগঠনিক অংশ নয় এবং কোন প্রাক সভ্য ICWF- এর কোন পদে নির্বাচিত ও ভোট প্রদানে যোগ্য নন। কিন্তু তারা তাঁদের নিজস্ব ফোরামে যে কোন পদে ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য।

৪। **সদস্যপদের শর্তাবলী:**

(ক) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তথা সেকশন ১ ও ২ এর প্রতি স্বীকৃতি ;

(খ) ICWF এর জন্য কাজ ও সর্বোত্তম সার্ভিস প্রদান করা ;

(গ) নিয়মিত চাঁদা প্রদান এবং তহবিল ও সামগ্রী সংগ্রহ করা ;

(ঘ) ICWF-এর নিয়মাবলী এবং ICWF ও তাঁদের নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্তবলী অনুসরণ ও মান্য করা।

৫। প্রাক সভ্যপদের শর্তাবলী:

(ক) বিজ্ঞান, বিশেষত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান জানতে আগ্রহী;

(খ) শোষণ হতে অর্থনৈতিক মুক্তির আকাংখা;

(গ) মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য বুভুক্ষ ও আকর্ষণ;

(ঘ) ICWF এর জন্য কাজ ও সর্বোত্তম সার্ভিস প্রদান করা ;

(ঙ) নিয়মিত চাঁদা প্রদান এবং তহবিল ও সামগ্রী সংগ্রহ করা ; এবং

(চ) ICWF-এর নিয়মাবলি এবং ICWF ও তাঁদের নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্তবলী অনুসরণ ও মান্য করা।

৬। **সাংগঠনিক কাঠামো**

কাউন্সিল, কমিটি এবং বিভিন্ন প্রকারের ইউনিট:

(১)কাউন্সিল সকল প্রকার রিপোর্টে সম্মতি বা অসম্মতি প্রদান করবে, সকল স্তরের কমিটি নির্বাচন করবে এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হচ্ছে সর্বোচ্চ অংগ এবং ইউনিট কমিটি হচ্ছে সর্বনিম্ন অংগ। আবশ্যকতা দেখা দিলে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী'র সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সংশোধনী কাউন্সিল গ্রহণ করবে। তবে সেক্ষেত্রে কাউন্সিলে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের ৮০% হ্যাঁ সূচক মতামত সাপেক্ষ

(২) প্রত্যেক বছর নিয়মিত কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে, কিন্ত যে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট অর্গানের সিদ্ধান্ত মতো নির্দিষ্ট তারিখের আগে-পরে তা অনুষ্ঠান করা যাবে।

৭।**কমিটি কাঠামো:**

(ক) ইউনিট:

(১) কাউন্সিল-সর্বনিম্ন ৩ এবং সর্বোচ্চ ৩০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে;

(২) কমিটি- ১ জন সমন্বয়ক, ১ জন সহ সমন্বয়ক এবং সর্বনিম্ন ১ এবং সর্বোচ্চ ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(খ) কেন্দ্রীয়:

(১) কাউন্সিল- কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত প্রতিনিধির সংখ্যা বা হিস্যামতো সকল নিম্ন পর্যায়ের অংগ হতে নির্বাচিত প্রতিনিধি, তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য এবং সকল কমিটির সমন্বয়ক বা সমন্বয়কের প্রতিনিধিগণ পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বের যোগ্য বিধায় তাঁদের সমন্বয়ে গঠিত হবে ।

(২) কমিটি-১ জন সমন্বয়ক, ১-৫ জন সহ সমন্বয়ক এবং সর্বনিম্ন ৭ এবং সর্বোচ্চ ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তবে প্রয়োজন হলে সহ-সমন্বয়ক বা সদস্য সংখ্যা বাড়াতে বা পরিবর্তন করতে পারবে কাউন্সিল। তাছাড়া কমিটি বিশেষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে কো-অপ্ট করতে পারবে।

বি.দ্র:

(১)সমন্বয়ক/সহ সমন্বয়ক এবং প্রত্যেক কমিটি সদস্য বা বিভিন্ন কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিষয়ে নিয়মাবলী, বিধানাবলী ও উপবিধিসমূহ পরবর্তীতে আরো সুবিস্তৃত হবে।

(২) কেন্দ্রিয় কমিটি এবং কেন্দ্রিয় কাউন্সিল ICWF এর বিভিন্ন প্রান্থ ও স্তর নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন কারণে কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষ সকল কমিটি উপবিধি ও নিয়মাবলী পাশ করতে পারবে।

(৩) সদস্য পদ প্রদান বা না প্রদান বা পুন:প্রদান করার সুযোগ ও অধিকার আছে প্রত্যেক কমিটির। নতুন সভ্যপদ প্রদান বা সাবেক বা অপসারিত সদস্যের সদস্যপদ পুন:প্রদান সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক কার্যকৃত হবে।

(৪)সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী বা উপবিধি সমুহ চূড়ান্ত করার পুর্বে –

(ক) কমিটি সদস্যদের করণীয় কর্ম ও দায়িত্ব সমুহ সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মতে বন্টিত হবে।

(খ) কাজ না করা, নিস্ক্রিয়তা এবং ICWF এর বিরুদ্ধে কাজ করা বা সেকশন ১ ও ২ অস্বীকার করা বা অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিতে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো বা নিয়মানুযায়ী কার্য সম্পাদন না করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মসমুহকে অকার্যকর করা অথবা ICWF নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্ত মান্য না করা বা সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যাওয়া বা সেন্টারের তহবিল তছরূপ করলে যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কমিটি কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষ উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তিকরণের পর অভিযুক্তের জবাবের উপযুক্ত বিবেচনা সাপেক্ষ বহিস্কার সহ যে কোন ধরণের যৌক্তিক ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৮। সিদ্ধান্ত:

অনুন্য দুই তৃতীয়াংশ হ্যাঁ সূচক ভোট সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে। তবে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী সংশোধনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের ৮০% হ্যাঁ সূচক ভোট সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

৯। সমন্বয় সাধন:

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধতা সমেত সমগ্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমন্নয়সাধনকারী অংগ হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

১০। বিলুপ্তি:

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর Information Centre for Workers Freedom বিলুপ্ত হইবে।

বি.দ্র– ইহা একটি সম্পূর্ণত সাময়িক সাংগঠনিক কাঠামো। একটা যুক্তিসংগত প্রস্তুতিমূলক সময়ান্তে বা এটি অনুন্য অর্ধ মিলিয়ন সদস্যের শক্তিতে উন্নীত হলে অথবা একটি বিশ্ব পরিসরের সংগঠনের নিকটবর্তী অবস্থায় উপনীত হলে তখন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল চূড়ান্ত করবে সাংগঠনিক নিয়মাবলী অর্থাৎ Information Centre for Workers Freedom একটি সংবিধান পরিগ্রহণ করবে।

বিশেষ লক্ষ্যণীয়:

ক। উন্নত দেশগুলোর জন্য সদস্য পদ ও নবায়ন ফি ৫ মার্কিন ডলার এবং অন্যান্যদের জন্য ২ ডলার। পুন:ভর্তি ফি দ্বিগুন।

খ। উন্নত দেশগুলোর জন্য বার্ষিক চাঁদা ১০ মার্কিন ডলার এবং
অন্যান্যদের জন্য ৪ মার্কিন ডলার।

গ। প্রাক সভ্য পদের জন্য সদস্যপদের ফি ও চাঁদার ৫০%।

ঘ। মোট ফি ও চাঁদার ৫০% কেন্দ্রিয় কমিটির ।

ঙ। আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক সদস্য পদ ও প্রাক সভ্য পদ ফরম পূরণ করে কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট নির্ধারিত ফি ও চাঁদা সহ প্রেরণ করতে হবে।

চ। কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট কমিটি সদস্য পদ বা প্রাক সভ্য পদ প্রদানে অপারগতায় তজ্জনিত ব্যয় কর্তন পুর্বক ফি ফেরত দিবে।

প্রথম সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত

Science - Science & Science for Freedom
Information Centre for Workers Freedom
Post Office-Bazar Jagatpur, Postal Code-3562,
District- Chandpur, Bangladesh.
e-m: icwfreedom@yahoo.com,icwfreedom@gmail.com, www.icwfreedom.org
(Estb-23Oct,2009)

Membership Form

Date:

I agreed with Basic Concept & Rules of ICWF. I am interested for Membership.

Name:

Date of Birth

Profession:

Address:

Signature

For Committee use only

Welcome ☐ Sorry ☐ M.Code

Signature of Co-ordinator
Central Committee / ----------Committee
Mobl: (880)016-75216486, 107-20858553, 017-17895857.

Science - Science & Science for Freedom

Information Centre for Workers Freedom
M.Card

Name:
Member Code:
Signature of Co-ordinator
Central/----------Committee

Science - Science & Science for Freedom

Information Centre for Workers Freedom

Post Office-Bazar Jagatpur, Postal code -3562, District- Chandpur, Bangladesh.
e-m: icwfreedom@yahoo.com, icwfreedom@gmail.com, www.icwfreedom.org

(Estb-23Oct, 2009)

Pre Member ship Form

Date:

I read Basic Concept and Rules of ICWF. I am interested for Pre Member ship.

Name:

Date of Birth

Profession:

Address:

Signature

For Committee use only

Welcome ☐ Sorry ☐ L. code

Signature of Co-ordinator

Central Committee / ----------Committee

Mobl: (880)016-75216486, 107-20858553, 017-17895857.

Science - Science & Science for Freedom

Information Centre for Workers Freedom
P.M.Card

Name:

L. Code:

Signature of Co-ordinator

Central/----------Committee